নানান কথায় কথকতা

এ কে শেরাম

CamScanner

সাধারণত আমি কবিতা লিখি; মণিপুরীবিষয়ক প্রবন্ধও লিখতে হয় আমাকে। তবে এর বাইরেও এক অন্তর্গত তাগিদ থেকে বিচিত্র বিষয় ও ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছি। এই লেখাগুলো নিতান্ত অবহেলায় পড়ে ছিল আমার রচনাসম্ভারের এককোনে। বই আকারে প্রকাশের কথা কখনও ভাবিনি। এবার কেন জানি মনে হল, এগুলোকে গ্রন্থিতরূপ দেওয়া যেতে পারে। এরই ফসল *নানান কথার কথকতা*।

প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু যেহেতু নানা রকমের, তাই নাম দিয়েছি *নানান কথার কথকতা*। তবে আমার বিশ্বাস আগ্রহী পাঠক এই রচনাগুলো পড়ে আনন্দ পাবেন। এই বিশ্বাসের ডানায় ভর করে বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধসমূহ সুধী পাঠকমহলের হাতে তুলে দিলাম।

প্রচ্ছদ : আল নোমান
লেখকের ছবি : এলেক্স বাবু

CamScanner

নানান কথার কথকতা

এ কে শেরাম

নাগরী

CamScanner

নানান কথার কথকতা
এ কে শেরাম

স্বত্ব : লেখক

প্র কা শ ক
নাগরী
বারুতখানা, সিলেট ৩১০০

প্র থ ম প্র কা শ
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ : আল নোমান

মূল্য : ১৮০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি.কম

Nanan Kothar Kothokota by A K Sheram
Published by NAGREE, Barutkhana, Sylhet 3100, Bangladesh
01714 610061, 01712 082967, nagree14@gmail.com
Price: ৳ 180 $ 10 £ 10 Rs 180
ISBN 978-984-8021-52-1

CamScanner

উৎসর্গ

আমার পরম আত্মীয়
সংস্কৃতিজন শ্রী অনিল কিষণ সিংহকে

CamScanner

কথামুখ

আমি মূলত কবিতা লিখি। কবিতাই আমার প্রথম ভালোবাসা। তবে প্রয়োজনের তাগিদে, বিশেষত এক সামাজিক দায়বোধ থেকে মণিপুরীবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। অনুরোধে পড়ে বা একরকম তাগিদ থেকেও এ-জাতীয় রচনার জন্ম। এরকম প্রবন্ধের সংকলিতরূপ হিসেবে বেশ কিছু বইও বেরিয়েছে। তবে এর বাইরে নিতান্ত এক অন্তর্গত তাগিদ থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছি। বিচিত্র বিষয় আর ভাবনা নিয়ে আমার এই প্রবন্ধগুলো। অনেক আগে থেকে লেখা এই রচনাগুলো নিতান্ত অবহেলায় পড়ে ছিল আমার রচনাসম্ভারের এক কোণে। এদের অধিকাংশই জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে বা বিভিন্ন সংকলনে বিভিন্ন সময়-প্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বই আকারে প্রকাশের কথা কখনও ভাবিনি। এবার কেন জানি মনে হল এগুলোকে গ্রন্থিত করে একটি বইয়ের রূপ দেওয়া যেতেই পারে। এরই ফসল এ গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু যেহেতু নানা রকমের, তাই নাম দিয়েছি 'নানান কথার কথকতা'। তবে আমার বিশ্বাস আগ্রহী পাঠক এই রচনাগুলো পড়ে আনন্দ পাবেন। এই বিশ্বাসের ডানায় ভর করে বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ সংকলন *নানান কথার কথকতা* সুধী পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

নানান কথার কথকতা প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন সিলেটের প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা সংস্থা 'নাগরী'। নাগরীর অধিকর্তা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। প্রকাশক ও পাঠক সবার জন্য রইল নিরন্তর ভালোবাসা।

এ কে শেরাম
ইমেইল: ak_sheram@yahoo.com

CamScanner

সূচি

স্বপ্ন এবং কতিপয় স্বপ্নচারীর কথা • ৯
শেষ দৃশ্য : শেষ সংলাপ—এক • ১৭
শেষ দৃশ্য : শেষ সংলাপ—দুই • ২৫
এপিটাফ সাহিত্য • ৩২
অন্য এক, অন্য কেউ • ৪৭
সৃজনশীলতা : দ্রোহ ও বেদনার উষ্ণীষ • ৫৩
কবিতা : এক অধরা প্রেমিকা আমার • ৫৬
স্বপ্ন দেখি স্বপ্নপূরণের • ৬৪
ভাষা নিয়ে ভাবনা • ৬৯
স্বপ্ন নিয়ে আমাদের স্বপ্নযাত্রা • ৭৬

CamScanner

স্বপ্ন এবং কতিপয় স্বপ্নচারীর কথা

মানুষ স্বপ্নবিলাসী। মানুষ স্বপ্ন দেখে—স্বপ্নকে লালন করে হৃদয়ের বিমল পক্ষপাতিত্বে এবং অনুকূল আলো-হাওয়ায় একদিন সে স্বপ্নকে অনুবাদ করে বাস্তবে। স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে যায় নিজস্ব নির্মাণকে—স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ ভবিষ্যতের অতলান্ত গহ্বরে রচনা করে স্বপ্নের ইমারত। স্বপ্ন দেখতে পারে বলেই মানুষ উপলব্ধি করে অন্য সব প্রাণীর তুলনায় নিজেদের প্রশ্নাতীত শ্রেয়োবোধ—স্বপ্ন দেখতে পারে বলেই মানুষ বুঝতে পারে স্বপ্নের অনিন্দ্য-অপার মহিমা। আর তাই, মানুষ হয় স্বপ্নচারী—মহাকালের মহাসমুদ্রে অনন্ত-অন্বেষার এক স্বপ্নের ডুবুরি।

ক

তেমনই এক স্বপ্নচারী মানুষ ছিলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবের মহানায়ক মাস্টার দা সূর্যসেন। কনডেম্‌ড সেল থেকে প্রিয় সহকর্মীদের উদ্দেশে জীবনের শেষ চিঠিতে মাস্টার দা সূর্যসেন লিখেছিলেন—'আমার তো এখন মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গানের সময়। সময় আমার অতীতের আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তের কথা স্মরণের। আমি দেখেছিলাম সোনালি স্বপ্ন। মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন। নিরবচ্ছিন্নভাবে আমি সারা জীবন তারই জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলাম—কতোটা এগিয়েছি জানি না। কমরেড্‌স, যদি মৃত্যুর শীতল স্পর্শ তোমাকে নিস্পন্দ করে তবে তুমি তোমার সাথীকে দিয়ে যেও লক্ষ্যে পৌঁছবার তাগিদ।'[১] ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে জাতির উদ্দেশে রেখে যাওয়া শেষ বাণীতে মাস্টার দা আরও বলেছিলেন—'প্রিয় আমার ভাইবোনেরা, বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেঁয়েমিকে ভেঙে দাও—তোমরা উৎসাহ দাও আমাকে। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? মাত্র একটি জিনিস। তা হল আমার স্বপ্ন—একটি সোনালি স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।'[২]

১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মাস্টার দা সূর্যসেনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাঁর স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ বেনিয়ারা। কিন্তু সূর্যসেন নিহত হলেও নিহত হয়নি তাঁর স্বপ্ন। আমরা জানি, কালের জরায়ুতে উপ্ত মাস্টার দার সেই স্বপ্নের ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল পৃথিবীর আলো ও বাতাসে—স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারতবর্ষ। বস্তুত, আমাদের পর-প্রজন্মের জন্য আমরা যা রেখে যেতে পারি তা

হল আমাদের স্বপ্ন—একটি সোনালি স্বপ্ন। আর কে-না জানে, স্বপ্ন তো অবিনশ্বর। সত্যিকার স্বপ্নের কোনও মৃত্যু নেই—একদিন না-একদিন তা জীবনের মুখ দেখবেই।

খ

আফ্রিকার কালো মানুষের ঘরেও একদিন জন্ম নিয়েছিল এমনই এক স্বপ্ন—নাম তাঁর প্যাট্রিস এমেরী লুমুম্বা। কঙ্গোর এক স্বাপ্নিক—এক জ্বলন্ত নক্ষত্রের নাম এই প্যাট্রিস লুমুম্বা। শুধু নিজের দেশে নয়, তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন সমগ্র আফ্রিকার আত্মাকেই। তাঁর স্বপ্ন ছিল তাঁর দেশের মানুষ, আর ওই মানুষের মুক্তি। তিনি স্বপ্নচারী ছিলেন—স্বপ্ন দেখতেন। আর স্বপ্ন দেখতেন বলেই তিনি লিখতেন কবিতা—যার সমস্ত মানচিত্র জুড়ে ছিল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর দেশ এবং দেশের মানুষ। তিনি লিখেছিলেন—

... ভাই আমার, এই তো প্রত্যূষ, এসে দাঁড়িয়েছে ভোর।
আমার মুখের দিকে তাকাও। আমাদের পুরোনো আফ্রিকাতে
নতুন সকাল এসে পড়েছে।
এখন শুধু আমাদেরই হবে এই ভূমি
জলাশয়, বিশাল নদীনালা—
আমাদেরই হবে এরা যাদের হাজার বছর
ধরে বেচারা নিগ্রো তুলে দিয়েছে অপরের হাতে।
সূর্যের কঠিন মশালগুলো আবার আমাদের
জন্য জ্বলবে, তোমার চোখের জলকে
মুখের ওপরকার থুতুকে শুকিয়ে দেবে;
যে মুহূর্তে তুমি শিকল ভাঙবে সেই মুহূর্তেই।[৩]
(আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয়, প্যাট্রিস লুমুম্বা)

কালের নিয়মেই একদিন স্বপ্ন সফল হল এবং শুরু হল ষড়যন্ত্রের কূটজাল বিস্তার। বিজয় ছিনিয়ে আনার মাত্র কয়েক মাস পরেই স্বাধীন কঙ্গোতেই ১৯৬০ সালের ১৪ সেপটেম্বর নিহত হলেন কঙ্গোর প্রিয় নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা। কিন্তু আফ্রিকার কালো কালো মানুষের উজ্জ্বল হৃদয়ে এখনও তিনি সমান জীবিত—এখনও সকলের স্বপ্নের নীলিমায় বেঁচে আছেন এই স্বপ্নচারী মানুষ, স্বাধীনতার অমর কবি—প্যাট্রিস এমেরী লুমুম্বা।

গ

চে' গুয়েভারা—যে নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে বিপ্লব, বিপ্লবী গেরিলার অদম্য এগিয়ে চলা—ভেসে ওঠে স্বপ্ন আর স্বপ্নভরা কবিতার কথা। চে' আর্নেস্টো গুয়েভারা স্বপ্ন দেখতেন আর স্বপ্নের জোনাকি পোকাগুলোকে সাজিয়ে

CamScanner

সাজিয়ে কবিতা লিখতেন। শুধু মনে ও মস্তিষ্কে নয়—পেটে ও পিঠে তিনি বয়ে বেড়াতেন অবিনশ্বর স্বপ্নের সোনালি শস্যদানা। আটকাবস্থায় চে'কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'তুমি এখন কী ভাবছো?' স্বপ্নের অতলান্ত গহ্বর থেকে তাঁর স্বপ্নালু দৃষ্টিকে তুলে এনে উত্তর দিয়েছিলেন চে'—'আমি বিপ্লবের অমরত্বের কথা ভাবছি।' ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে মিলে কিউবার বিপ্লবকে সফল করেছিলেন চে' গুয়েভারা—মন্ত্রী হয়েছিলেন ক্যাস্ট্রোর সরকারে। কিন্তু আজন্ম বিপ্লবী চে' তো এক বৃত্তাবদ্ধ জীবনের মায়ায় কোনও বিপ্লবের সোনালি আমন্ত্রণকে এড়াতে পারেন না; তাই আরেকটি বিপ্লবের আহ্বানে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন বলিভিয়ার গহিন জঙ্গলে—গড়ে তুলেছিলেন অদম্য এক গেরিলা বাহিনী। আর্জেন্টাইন বিপ্লবী চে' গুয়েভারা কিউবা এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে বড়ো বেশি ভালোবাসতেন। ক্যাস্ট্রোর জন্য শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'যদি অন্য আকাশের নিচে আমার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে তাহলে, এই জনতা এবং বিশেষ করে, তুমিই হবে আমার শেষ ভাবনা।' ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর বলিভিয়ার ছোট্ট পাহাড়ি শহর লা হিগুয়েরা গ্রামের একটি স্কুলঘরে বন্দি চে' গুয়েভারাকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। কিন্তু হত্যাকারীরা কি হত্যা করতে পেরেছে চে'র অবিনশ্বর স্বপ্নকে? উত্তর—না। কারণ, কেউই তো একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, এই স্বপ্নচারী মানুষই এখনও স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছে নিপীড়িত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে।

চে'র মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল পাবলো নেরুদার একটি কবিতার বই—'কান্টো জেনারেল'। চে' তাঁর ডায়েরিতে নেরুদার কবিতা 'বলিভারের জন্য গান' থেকে একটি লাইন লিখে রেখেছিলেন—'তোমার ছোট্ট মৃতদেহটা একজন সাহসী সেনাধ্যক্ষের মত।' যেন কবিতার পঙক্তি নয়, এক স্বপ্নদ্রষ্টা কবির অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী। চে' নিজে কবিতা লিখতেন। তাঁর স্বপ্নগুলো সোনালি মাছের মত সাঁতরে বেড়াতো তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে।

তুমি বলেছিলে, সূর্যোদয় হবে।
চল যাই
সেই অচিহ্নিত পথে
তোমার ভালোবাসার সবুজ কুমারকে মুক্ত করতে।
এবং চলো আমরা
সকল উপেক্ষাকে তুচ্ছ করি
বিদ্রোহী প্রগাঢ় নক্ষত্র প্লাবিত ভ্রূকুটিতে।
হয় জয়ী হবো না হয়
মৃত্যুকে যাবো পেরিয়ে।

.. ..

আমেরিকার ইতিহাস রচনায়
আমাদের সামনে যদি ইস্পাত-বাধা আসে
তাহলে আমাদের গেরিলা অস্থি
ঢাকার জন্য চাই শুধু কিউবার অশ্রুধারা
আর কিছু নয়[৪]   [ফিদেলের জন্য গান, চে' গুয়েভারা)

ঘ

স্বপ্ন দেখতেন তিনিও—স্বপ্ন দেখাতেন অন্যদের; হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতেন সেই স্বপ্নের ঢেউ সংগীতের সুরে সুরে। স্বপ্নতাড়িত এই শিল্পীর নাম জন লেনন, বিটল্‌স চতুষ্টয়ের অন্যতম। ইয়োকে ওনোর সঙ্গো প্রেম এবং বিয়ের পর লেননের সৃজনশীলতা স্পর্শ করে নতুন মাত্রা। দুজনের মিলিত সাধনা লেননকে নিয়ে যায় উপলব্ধির অন্য জগতে। এ সময়েই রচিত হয় তাঁর দুটি বিখ্যাত গান—'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' এবং 'ইমাজিন'। তাঁর আর-এক বিখ্যাত গান হল—'গিভ পিস এ চান্স'। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শান্তিময় এক বিশ্বের, দেখতেন বিশ্বের সব রাষ্ট্রীয় সীমানা উঠে যাবে একদিন, দূর হবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বুকে সংঘটিত নৃশংস গণহত্যায় শোকার্ত শিল্পী রবিশংকরের সঙ্গো মিলে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে আয়োজন করেছিলেন 'বাংলাদেশ কনসার্ট' নামের বিশাল সংগীতসভার। কিন্তু, এই স্বপ্নচারী নির্বিরোধ শিল্পী মানুষটিও তাঁর আয়ুর কক্ষপথে বেশিদূর হেঁটে যেতে পারেননি। অকস্মাৎ একদিন তিনিও নিহত হন আততায়ীর গুলিতে ১৯৮০ সালের ৮ ডিসেম্বরে। তবে আততায়ীর হাতে লেনন নিহত হলেও নিহত হয়নি তাঁর সোনালি স্বপ্ন। আজও গানে গানে বিশ্বময় বয়ে চলেছে তাঁর সে স্বপ্নের অবিনাশী চেতনা।

ইয়োকে ওনোর একটি উক্তি লেননেরও খুব প্রিয়—'মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে একা, তখন তা স্বপ্নই থাকে। যখন স্বপ্ন দেখে সবাই মিলে, তখন তা হয়ে ওঠে বাস্তব।' জন লেনন তাই তাঁর স্বপ্নকে ছড়িয়ে দিতেন সকলের মাঝে, চাইতেন সকলে মিলে সে স্বপ্ন দেখতে—যাতে সে স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ওঠে। তাঁর গানে বিধৃত আছে সেই স্বপ্নেরই কথা।

মনে করো নেই কোনও স্বর্গ
নরক বলেও নেই কিছু আর
ভাবতে চাইলে সহজ এই ভাবনা
আছে শুধু উদার আকাশ
মনে করো সব মানুষের
জীবনের জন্যই জীবনযাপন

মনে করো নেই কোনও রাষ্ট্র

CamScanner

শক্ত নয় মোটেই এই ভাবনা
মরবার কি মারবার নেই কোনও তাগিদ
নেই কোনও ধর্মের আচার
মনে করো সব মানুষের
শান্তিতে চলছে জীবন

বলতে পারো আমি স্বপ্নচারী
কিন্তু আমি তো আর একা নই
আশা রাখি একদিন পাবো তোমাকেও
এবং এক হয়ে উঠবে গোটা বিশ্ব।[৫]

[ইমাজিন (মনে করো), জন লেনন]

ঙ

আমি আরেক স্বপ্ননায়কের কথা বলতে চাই—যিনি রূপসি বাংলার এক প্রত্যন্ত জনপদ থেকে উঠে এসে একদিন পরিণত হয়েছিলেন সমগ্র জাতির প্রতিভূপুরুষে—তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির শৃঙ্খলমুক্তির স্বপ্ন তাঁর সিংহ-হৃদয়ে লালিত হয়ে একদিন স্বাধীনতার সোনালি সূর্যরূপে উদিত হয়েছিল বাংলার আকাশে। তিনি বাঙালির ললাটলিপি থেকে মুছে দিয়েছিলেন ভীরুতার সমস্ত কলঙ্কচিহ্ন—মুছে দিয়েছিলেন নতজানু আর বামনত্বের সমস্ত অপমানভার। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখতেন শৃঙ্খলমুক্ত এক জীবনের—অর্থনৈতিক মুক্তির; আর সে স্বপ্নকে তিনি ছন্দিত আবেগে প্রবাহিত করতেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়স্পন্দনে। মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা তাঁকে করে তুলেছিল বাংলা ও বাঙালির প্রতীকী-পুরুষে। তাই তিনি দ্বিধাহীন উচ্চারণে বলতে পারতেন—'ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে বলব বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, আমি বাঙালি।'[৬] তিনি কবি, তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ ছিল কবিতার মত। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা নামক অমর কাব্যের মহান কবি। কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়—

শত বৎসরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মত দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
কখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা—
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠবাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর

CamScanner

কবিতাখানি :

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
(স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল, নির্মলেন্দু গুণ)

প্রতিটি স্বপ্নচারী কবি মাত্রই স্বপ্নদ্রষ্টা—ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। বঙ্গবন্ধুও কি তাঁর স্বপ্নের নীলিমায় দেখেছিলেন নির্মম নিয়তির ছায়াপাত? তাঁর দ্রষ্টা চোখে কি ধরা পড়েছিল তারই অন্তিম পরিণতি—জিরাফের মত বাড়িয়ে দেওয়া মৃত্যুর কুৎসিত দীর্ঘ গ্রীবার ছায়া কি প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর দৃষ্টির লেন্সে? হয়ত তাই তিনি বলেছিলেন—'এদেশের মানুষ আমার জীবনের জন্য অজস্র রক্তপাত করেছে। দরকার পড়লে আমি আমার দেশের মানুষের রক্তের ঋণ নিজের রক্ত দিয়ে পরিশোধ করবো।' কী অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী! ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের সুবেহ্‌সাদিকে স্বাধীনতার চতুর্থ বছরে নিজ দেশের মাটিতেই আততায়ীর বুলেটে বিদ্ধ বঙ্গবন্ধু বুকের রক্তস্রোতে বাংলার মাটি ভিজিয়ে দিয়ে শোধ করেছিলেন বাংলার মানুষের রক্তঋণ।

তাহলে কি স্বপ্নচারী সব মানুষের নিয়তিই একসূত্রে বাঁধা? পথ চলতে চলতেই পথের মাঝখানে হারিয়ে যাওয়াই কি তাঁদের ভাগ্যলিপি? কেউ কেউ বুঝি তাই বলে থাকেন—স্বপ্নচারী মানুষেরা জীবনের অপূর্ণতারই প্রতীক। কিন্তু, তা-ই বা বলি কী করে? যখন দেখি এই আপাত-অপূর্ণ জীবনই নিয়ে যায় সমগ্রের জীবনকে এক পূর্ণতার দিকে তখন তো ভাবতে প্রলুব্ধ হই এই অপূর্ণতা, অপূর্ণতা নয়—এই মৃত্যু, মৃত্যু নয়; বরং তার চেয়ে অধিক কিছু। কারণ, কোনও কোনও মৃত্যু দিয়ে যায় অনন্ত জীবন—এ মৃত্যুও তা-ই। এই সব স্বপ্নচারী মানুষের অনশ্বর জীবন মৃত্যুতে থেমে থাকে না—পরিচিত মৃত্যুর চৌহদ্দি পেরিয়ে মৃত্যুর অতীত কোনও লোকে শুরু হয় তাঁদের অনন্ত যাত্রা। কবি দিলওয়ারের ভাষায়—

'যে তুমি এখন নেই মানবের পরিচিত গ্রহে
সে তুমি নিয়ত আছো চিরন্তন আয়ুর আবহে।'

এই স্বপ্নচারী মানুষেরা স্বপ্ন দেখতে প্রলুব্ধ করেন আমাদের। আমরা তাই স্বপ্ন দেখি বারংবার। কোনও স্বপ্নতাড়িত কবি তাই বলেন—

'এবারে এখনও প্রবাসে
আগামীতে জেরুজালেম
এখনও শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছি
আগামীতে স্বাধীনতা।'[৮] (জনৈক ফিলিস্তিনি কবি)

এর নামই তো স্বপ্ন। অবিনাশী এ স্বপ্নের স্বপ্নযাত্রা কোনও নশ্বর মৃত্যুতে স্তব্ধ হয় না—কেবলই এগিয়ে চলে অবিনশ্বরতার এক অনাদি-অনন্ত পথে। আমরাও

স্বপ্ন দেখেছিলাম বায়ান্নতে—উনসত্তরে। তারপর সত্তরের পথ বেয়ে একাত্তরে এসে সে স্বপ্ন বাস্তবে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃস্বপ্নের এক কালরাত এসে সহসা ঢেকে দিয়েছে আমাদের স্বপ্নের এই সোনালি সকাল। আমাদের স্বপ্নেরা বারবারই পরাস্ত হয়েছে—পর্যুদস্ত হয়েছে। যে লক্ষ্য-আদর্শকে নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল—যে স্বপ্নের সোনালি সূর্যকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল—সেই স্বপ্ন আজ পরাভূত। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ অন্তর্হিত—সত্য ইতিহাস আজ বিকৃত। আমাদের পিতা নিষিদ্ধ—ঘৃণা মাতা লাঞ্ছিতা—সাহসী ভাই নির্বাসিত। আমাদের আকাশে আজ নির্ভাবনায় ডানা মেলে পরাজিত শকুন—রাজপথে কোলাহল করে পলাতক শৃগাল। কিন্তু, তারও অনেক পরে এসে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কি আমরা আবার স্বপ্ন দেখিনি? আমরা কি আবার মাথা তুলে দাঁড়াইনি—ফুঁসে ওঠিনি যূথবদ্ধ শক্তিতে? আমরা কি আমাদের প্রত্যাশার প্রহরগুলোকে তুলে ধরিনি স্বপ্নের মোড়কে? অথচ, স্বপ্নের সোনালি প্রত্যুষ নয়—দঃস্বপ্নের মায়াবী পর্দা এখনও দুলে দুলে ওঠে দৃষ্টির সামনে। স্বপ্নতাড়িত আমরা এখন বাঁধা পড়ে আছি দুঃস্বপ্নের মায়াজালে। আর এ কারণেই ছিয়ান্নব্বইতে আবার আমরা ফুঁসে উঠেছি—জেগে উঠেছি আমাদের স্বপ্নের সুনীল সৈকতে। আসলে, এভাবেই মানুষ বারবার জেগে ওঠে—সৃষ্টির কাছে দায়বদ্ধ জীবনের স্বার্থেই জীবন বার বার মাথা তুলে দাঁড়ায় এ-ভাবেই। কারণ, মানুষ যেমন ঋজুদেহী, তেমনই রক্তস্রোতও উর্ধ্বমুখী। মানুষ তাই চিরকাল নতজানু থাকে না। একবার না-একবার তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হয়। মানুষের ইতিহাস তা-ই বলে।

জন্মের পরিচয়ে মানুষ মাত্রই আন্তর্জাতিক—এক অখণ্ড মানবিক বোধে উজ্জীবিত মানুষের মানবিক সত্তা। কিন্তু, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মোহাচ্ছন্নতা মানুষকে নিয়ত খণ্ডিত করে—বিভাজিত করে। আমাদের সামগ্রিক পরিচয়ের চেয়ে এখন এই খণ্ডিত পরিচয়ই ক্রমশ প্রধান হয়ে উঠছে। আমরা যতটুকু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান অথবা বাঙালি, শিখ, মারাঠি বা মণিপুরী—ততটুকু মানুষ হয়ে উঠতে পারছি না। মানুষ আমরা এখনও মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রামেই ব্যাপৃত। অথচ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারলে—অখণ্ড মানবিক বোধে জেগে উঠতে পারলেই দুঃস্বপ্নের এই মায়াবী পর্দা হাওয়ায় মিলিয়ে যেত—আমাদের হাতের নিপুণ মুদ্রায় ধরা দিতো সমূহ স্বপ্নের সোনালি কোরক। অতএব, আমাদের আজকের স্বপ্ন হোক মানুষের মানুষ হয়ে ওঠা, কোনও খণ্ডিত পরিচয় বা ভেদবুদ্ধির বিভাজনে নয়—অখণ্ড মানবিক বোধে জেগে ওঠা পরিপূর্ণ মানুষ। কোনও নতমুখ, নতজানু, বামন নয়—আমাদের কাঙ্ক্ষা হোক এক উর্ধ্বমুখী ঋজুদেহী দীর্ঘ মানুষ। এই স্বপ্ন নিয়ে আমরাও আজ ভিড়ে যেতে চাই স্বপ্নচারী মানুষের দলে।

মানুষ যখন উঁচু হয়
আকাশ তখন নিচে নেমে আসে।
তুমি উর্ধ্বমুখী হলে, হে মানুষ
আকাশের চাঁদ ও তারা গড়াগড়ি খাবে মাটি ও ঘাসে।

আর কত নতজানু হবে তুমি?
আর কত বামন হবে?
তুমি উঁচু হও—দীর্ঘ হও, হে মানুষ
আকাশকে তখন তুমি দু-হাতে ছোঁবে।
(মানুষ, এ কে শেরাম)

আসুন, আমরাও আজ স্বপ্নচারী হয়ে যাই—দু-হাত বাড়াই আকাশের দিকে। আর এভাবেই আমরা হয়ে উঠি পরিপূর্ণ এক মানুষ—উঁচু, দীর্ঘ, উর্ধ্বমুখী এক সম্পন্ন মানুষ।

সিলেট, ১৯৯৫

তথ্যসূত্র

১. কামাল লোহানী; মাস্টার দা, লহ রক্তিম অভিবাদন; মাস্টার দা সূর্যসেনের জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র; দৈনিক জনকণ্ঠ; ২১ মার্চ, ১৯৯৪;
২. এম. কবিরুল ইসলাম; মাস্টার দার অবদানের স্বীকৃতিই হবে তাঁর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ; দৈনিক জনকণ্ঠ; ২১ মার্চ, ১৯৯৪;
৩. ফরিদ কবির; লুমুম্বা : সরে যেতে হল ফুল ফুটবার আগেই; ভোরের কাগজ সাময়িকী; ১ এপ্রিল, ১৯৯৪;
৪. মতিউর রহমান; চিরতরুণ গেরিলা চে'; ভোরের কাগজ সাময়িকী; ১ এপ্রিল, ১৯৯৪;
৫. মফিদুল হক; জন লেনন : স্বপ্নের দেবশিশু; ভোরের কাগজ সাময়িকী; ১ এপ্রিল, ১৯৯৪;
৬. আশীষ-উর-রহমান শুভ; কোটি মানুষের আজন্ম লালিত স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছে তাঁর মৃত্যুতে; দৈনিক জনকণ্ঠ; ১৬ আগস্ট, ১৯৯৪;
৭. প্রাগুক্ত;
৮. রোববার; ৩ অক্টোবর, ১৯৮২;

CamScanner

শেষ দৃশ্য : শেষ সংলাপ—এক

পৃথিবী এক বিশাল রঙ্গামঞ্চ। আর আমরা, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তান এই মানুষেরা, এই বিশাল রঙ্গামঞ্চের এক-এক কুশীলব। আমরা সবাই নির্ধারিত দৃশ্যে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আবির্ভূত হচ্ছি মঞ্চে, আর নিয়তি-নির্দেশিত চরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি জীবননাট্যের পালায়। অবশ্য এ নতুন কোনও কথা নয়। কিন্তু, এই যে আমরা জীবনব্যাপী অভিনয় করে যাচ্ছি বর্ণিল বৈভবে, বিচিত্র সব সংলাপ আউড়ে যাচ্ছি একের পর এক—তারও পরিসমাপ্তি ঘটে একসময়। একসময় আমাদের দাঁড়াতেই হয় জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যে—উচ্চারণ করতে হয় শেষতম সংলাপ। তারপর, পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে গিয়ে একসময় আমাদের হারিয়ে যেতে হয় পার্শ্বপর্দার অন্ধকার-অন্তরালে। সহস্র সহস্র বর্ষকাল ধরে অভিনীত এই জীবননাট্যের কোটি কোটি কুশীলবেরা এমনি করেই নিজ-নিজ অভিনীত চরিত্রের শেষ দৃশ্যে এসে শেষতম হিসেবে আউড়ে গেছেন একেক রকম সংলাপ। তারই মধ্য থেকে নির্বাচিত ক'টি চরিত্রের শেষ দৃশ্যের শেষ সংলাপ নিয়েই আজকের এই গ্রন্থনা—'শেষ দৃশ্য : শেষ সংলাপ'।

১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি সার্বভৌম। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যাঁর এক পরিশীলিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে; কবিতা নিষিক্ত যাঁর আজন্মের আবহেই—যিনি 'জল পড়ে পাতা নড়ে' দিয়ে শুরু করে আমৃত্যু রচনা করে গেছেন অজস্র কবিতার কলোত্তীর্ণ পঙ্‌ক্তিমালা, যিনি তাঁর জীবনের শেষ দৃশ্যে এসেও তেমনই আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক অসাধারণ কবিতা।

৩০ জুলাই ১৯৪১। শেষ চেষ্টা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে অস্ত্রোপচার করা হয়। তার আগে আগে তিনি মুখে মুখে রচনা করেন একটি কবিতা—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'। অস্ত্রোপচারের পর সেই যে জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি, সেই জ্ঞান আর সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসেনি কখনও। কখনও কখনও অর্ধচৈতন্যে বিড়বিড় করে বলেছেন অস্ত্রোপচার-উত্তর তাঁর শারীরিক ব্যথা-বেদনার প্রায় অসংলগ্ন কথা। ৪ আগস্ট। অসুস্থ প্রিয় পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এলেন। রবীন্দ্রনাথের কানের কাছে মুখ এনে 'বাবামশাই' 'বাবামশাই' বলে প্রাণপণ ডাকলে একবার

অনেক কষ্টে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর একসময় দূরাগত ধ্বনির মত রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে এক অস্পষ্ট উচ্চারণে শুধু বেরিয়েছিল—'কী যে হবে কিছু বুঝতে পারছি নে, কী হবে।' অতঃপর ৭ আগস্ট ১৯৪১ (২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮), বৃহস্পতিবার রাখিপূর্ণিমার দিন বেলা বারোটার কিছু পরে ৮০ বছর ৩ মাস বয়সে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বাকি দিনগুলো তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন চেতনে-অবচেতনে, আলো-আঁধারির এক সূক্ষ্ম দোলাচলে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের শেষ সজ্ঞান উচ্চারণ তাঁর এই শেষ মৌখিক রচনা—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।[১]

CamScanner

২

১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি। মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখার অপরাধে বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি এবং রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক চট্টগ্রাম বিপ্লবের মহানায়ক মাস্টার দা সূর্যসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু, বীর যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুভয়ে ভীত নয়—মৃত্যুই বরং তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ায় বন্ধুর মত, অনুগত ভৃত্যের মত। তাই তো সূর্যসেন নিষ্কম্প কণ্ঠে বলতে পারেন—'আমার তো এখন মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গানের সময়।' স্বাধীনতার প্রবল আকুতি নিয়ে সংঘটিত সেদিনের সেই চট্টগ্রাম বিপ্লবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন অনেক প্রাণ; অনেক বীরের রক্তস্রোতে—অনেক মায়ের অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল সেদিন মুক্তিপিয়াসী এদেশভূমি। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলেন অনেকেই—

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারি তবে শুধিবে না ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'

কিন্তু, মাস্টার দা সূর্যসেন এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে দ্বিধাহীন ছিলেন। তাই তো তিনি ফাঁসির মঞ্চে দৃপ্তপদে উঠে গিয়ে জীবনের শেষ উচ্চারণে বলেছিলেন—'প্রিয় আমার ভাইবোনেরা, বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেঁয়েমিকে ভেঙে দাও তোমরা, উৎসাহ দাও আমাকে। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? মাত্র একটি জিনিস। তা হল আমার স্বপ্ন—একটি সোনালি স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।'(২) এবং আমরা জানি, ধরার ধুলায় সেদিন হারিয়ে যায়নি বীরের সে রক্তস্রোত—নিষ্ফল হয়নি মায়ের অশ্রুধারা। মাস্টার দা সূর্যসেনের স্বপ্ন একদিন যথার্থই অনূদিত হয়েছিল বাস্তবে—স্বাধীন হয়েছিল ভারতবর্ষ।

৩

যাঁরা স্বপ্ন দেখেন মহত্তর কোনও জীবনের—নূতন সূর্যোদয়ের, তাঁদের কাছে জীবন ও মৃত্যু মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাঁদের জীবনে মৃত্যু যে কোনও মুহূর্তেই এসে হানা দেয় অনাহুত এক অতিথির মত। কিন্তু, এমনই কোনও কোনও মৃত্যু কখনও এতটাই মহিমান্বিত যে, মৃত্যুকে ছাপিয়ে সেখানে জীবনের জয়গানই মুখর হয়ে ওঠে। আর মৃত্যু, ভীরু শৃগালের মত, নিঃশব্দে পালিয়ে যায় আপন অন্ধকারে। কর্নেল আবু তাহেরের মৃত্যু তেমনই এক আলোকিত মৃত্যু—যে মৃত্যুর দীপ্তি অনায়াসে ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশে—কাল থেকে কালান্তরে। জীবন নাটকের এক চরম বিয়োগান্তক দৃশ্যে আমরা দেখি মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অকুতোভয়

CamScanner

সেনানায়ক, বীরউত্তম পদকে ভূষিত অন্যতম সেক্টর কমান্ডার যুদ্ধাহত বীর কর্নেল তাহেরকে অবশেষে তাঁরই স্বাধীন মাতৃভূমিতে জীবন দিতে হয় তাঁর শৌর্য, বীর্য এবং নিরাপোশ দেশপ্রেমের জন্যই।

১৯৭৬ সালের ২০ জুলাইয়ের দিবাগত রাত। দীর্ঘ সে রাতের শরীরে জমেছে অনেক মেদ। দিনপঞ্জিকার হিসাবে শুরু হয়েছে ২১ জুলাই। রাত দুটোর কিছু পরে ফাঁসির আসামিদের জন্য নির্দিষ্ট আট সেলের ৪ নম্বর সেলে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন কর্নেল তাহের। ধীরে সুস্থে হাত মুখ ধুয়ে পরিপাটি হলেন। গায়ে চাপালেন সাদার ওপর নীল রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। নকল পা পরে প্যান্ট পরলেন। চুল আঁচড়ালেন যত্ন করে। তারপর সমবেত কারাকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা এত বিষণ্ন কেন? আমি তো বিষণ্ন নই, ভীতও নই। বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। মৃত্যু কখনও আমাকে পরাজিত করতে পারেনি। আমিই প্রতিবার মৃত্যুকে পরাজিত করেছি।' নির্বাক বিষণ্নতায় কারাকক্ষে তখন পাথুরে স্তব্ধতা। কারা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন ফাঁসির আরও কিছু সময় বাকি আছে। তারপর উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন তাঁরই এক সহযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দিনের লেখা একটি কবিতা—

জন্মেছি, সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে
কাঁপিয়ে দিলাম।
জন্মেছি, তোদের শোষণের হাত দুটো ভাঙ্গাবো বলে
ভেঙে দিলাম।
জন্মেছি, মৃত্যুকে পরাজিত করবো বলে
করেই গেলাম।
পাপী আর পাপ থেকে দূরে থাকবো
তাই হাতে অস্ত্র নিলাম।
ইতিহাস চলবেই
শোষকের মৃত্যুকবজ আমিই ছিলাম।
.. ..
জন্ম আর মৃত্যুর দুটি বিশাল পাথর
রেখে গেলাম
পাথরের নিচে শোষক আর শাসকের
কবর দিলাম।
পৃথিবী—অবশেষে এবারের মত বিদায় নিলাম।

কবিতা শেষ হল। সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ। কারাকক্ষের সেই থমথমে নিস্তব্ধতা ভেঙে তাহের বললেন—'চলুন যাই'। তারপর ওয়াকিং স্টিক হাতে দৃঢ়

পায়ে এগিয়ে গেলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল ছটায় চারদিকে আলোর বন্যা। ফাঁসির মঞ্চে গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল তাহের। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত এখন তিনি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। এর মধ্যে একজন এগিয়ে এলেন কালো টুপি হাতে। হাত উঁচিয়ে বাধা দিলেন তিনি—'মুখ ঢাকতে হবে না।' সামনে ঝুলন্ত ফাঁসির দড়ি নিজেই পরে নিলেন গলায়। জিজ্ঞেস করলেন—'সব ঠিক আছে তো?' উত্তরহীন দীপ্র প্রশ্নটিই কেবল গম্‌গম্ করে উঠল। বললেন—'দড়ি বেশ মসৃণ। মুহূর্তগুলো অতি দীর্ঘ মনে হয়।' তারপর তাহের উঁচু গলায় বললেন—'I am ready. Do your duty.' ভোর ৪ টায় পায়ের নিচের পাটাতন সরে গেল। আর ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তেই শোনা গেল কর্নেল তাহেরের কণ্ঠে শেষতম দীপ্র উচ্চারণ—

'Long live my countrymen
Long live revolution.'[৩]

৪

স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা বা বিপ্লবী নেতারাই যে শুধু সাহসী, মৃত্যুঞ্জয়ী—তা নয়। বরং যাঁরাই জীবনকে উপলব্ধি করেছেন পরিপূর্ণভাবে—জীবনের সত্যকে আত্মস্থ করেছেন আপন প্রত্যয়ে, তাঁরাই মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জীবনের জয়গানে মুখর হতে পেরেছেন। তাঁরাই বলতে পেরেছেন, 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। আমরা তাই দেখি মহামনীষী চার্লস ডারউইন, এ বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকৃতিবিজ্ঞানী, যিনি এখনও আলোচিত এবং নন্দিত তাঁর বিবর্তনবাদের জন্য, ১৮৮১ সালের ১৯ এপ্রিল জীবনাবসানের পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যুর বরফশীতল অমোঘ অধিকারে হারিয়ে যাবেন নিশ্চিত জেনেও নিঃশঙ্কচিত্তে শেষ উচ্চারণে বলেছিলেন—'মৃত্যুতে আমার কোনও ভয় নেই।'[৪]

৫

আমরা জানি, বীর যাঁরা—মৃত্যুঞ্জয়ী যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু, শাসকশক্তি চিরকালই সত্যকে ভয় পায়। তাই সত্যের সাধকেরা সব সময়ই শাসকদের চক্ষুশূল। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসও সত্যসন্ধানী ছিলেন বলেই—আপন সত্যকে ব্যাপ্ত করতে চেয়েছিলেন বলেই রাজশত্রু হয়ে পড়েছিলেন এবং সত্যের জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁকেও জীবন দিতে হয়েছিল হেমলক পানে।

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ডেলফি শহরের এ্যাপোলো মন্দিরের দেবী পাইথিয়া একবার দৈববাণী করলেন যে, সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই। সক্রেটিস এ বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করতে চাইলেন। তাই তিনি গেলেন রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে, কবিদের কাছে এবং কারিগরদের

কাছে। কিন্তু তিনি দেখলেন, তাঁরা সকলেই অনেক কিছু জানেন—তবে তাঁদের কেউই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নয়। তাই তিনি সিদ্ধান্তে এলেন—'আসলে, কেউই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নন—রাষ্ট্রপরিচালকেরা নয়, কবিরা নয়, কারিগরেরা নয়, এমনকী আমিও নই যার সম্পর্কে ডেলফিতে দৈববাণী শোনা গিয়েছিল। কিন্তু আমি অন্তত এটুকু জানি যে, আমি কিছুই জানি না।'[৫]

সক্রেটিস ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক মুক্ত মানুষ। কোনও পার্থিব লোভই তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তিনি যখন এথেন্সের বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটতেন তখন দুপাশের ভোগ্যপণ্যে পূর্ণ দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন—'এসবের কোনও কিছুতেই আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।' অথচ এই নির্লোভ, নির্মোহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষটির জীবন কিন্তু নির্বিবাদ ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী এবং চাইতেন সত্যের প্রতিষ্ঠা। আর তাই, শাসকশক্তি ভীত হয়ে পড়লেন। দেশের যুবশক্তিকে বিপথগামী করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হল সক্রেটিসকে। বিচারের অনিবার্য রায় মৃত্যুদণ্ড। রায় কার্যকর হওয়ার সময় হেমলক বিষে পূর্ণ পেয়ালা হাতে সক্রেটিস নিষ্কম্প কণ্ঠে বিচারকমণ্ডলী এবং সমবেত জনতার উদ্দেশে শেষ বাণীতে বলেছিলেন—'The hour of departure has arrived, and we go our ways— I to die, and you to live, which is better only God knows.'[৬] অর্থাৎ, 'বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত। আমরা আমাদের পথ চলছি—আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আপনারা বেঁচে থাকবেন। কিন্তু কোনটি যে ভালো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' এক মহান দার্শনিকের মহত্তম এক উচ্চারণ। আসলেই তো তাই। এক আলোহীন অন্ধকার আকাশের তলে এক নতজানু জীবনযাপনের চেয়ে অনেক সময়ই অনেক বেশি প্রত্যাশিত এক আলোকিত মৃত্যু। এই এতকাল পরেও কি আমাদের কখনও কখনও মনে হয় না—'মৃত্যু ভালো/ না কি ভালো এই বেঁচে থাকা?'

৬

জীবনের শেষতম সংলাপে এমনই এক পরম দার্শনিক সংলাপ আওড়ে গেছেন মহাকবি গ্যেটে। তিনি বলেছিলেন—'More Light.'—আরও আলো। আসলে, মানুষ, এই পৃথিবী অথবা সভ্যতা চিরকালই আলোর কাঙাল। অন্ধকারের বুক চিরে আলোর উৎসারণ, কিংবা আঁধার ঘেঁটে ঘেঁটে অমৃত সূর্যকে ছিনিয়ে আনার প্রয়াসই পেয়েছেন যুগে যুগে পৃথিবীর সকল মহৎ মানুষ। কিন্তু, জার্মান মহাকবি গ্যেটে আসলে তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পৃথিবীকে কোনও দার্শনিক বাণী শোনাবার উদ্দেশ্যে একথা উচ্চারণ করেননি। বরং, যখন তাঁর সমস্ত শরীর ক্রমশ বিবশ হয়ে আসছিল—এক সর্বভুক অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল তাঁর পরিচিত পৃথিবী—একটু আলোর জন্য কাঙালের মত যখন তিনি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন চারদিক, তখনই তিনি অগ্নিগর্ভ অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুবে যেতে যেতে শেষবারের মত

গৃহভৃত্যকে ডেকে বলেছিলেন—'More Light.' বলেছিলেন ঘরের জানালার বন্ধ পাল্লাটা খুলে দিতে—যাতে আলো, আরও আলো আসে ঘরে।[৭]

৭

আলবার্ট আইনস্টাইন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ১৯৫৫ সালের ১৬ এপ্রিল নিজের বাসভবনে বাথরুমে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান—ভর্তি করা হয় তাঁকে প্রিন্সটোন হাসপাতালে। কিছুক্ষণ পরই শিরা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। কিন্তু নির্বিকার আইনস্টাইন অনর্গল কথা বলে যেতে থাকেন তাঁর ছেলের সঙ্গে। প্রসঙ্গ—কখনও রাজনীতি, কখনও-বা তাঁর অসমাপ্ত কাজ। ধীরে ধীরে মলিন ও ফ্যাকাশে হয়ে আসছিল তাঁর চেহারা। অপারেশনের জন্য ডাক্তারদের বার বার অনুরোধ তিনি কানেই তুললেন না—যেন তিনি অন্তরঙ্গ আকাঙ্ক্ষায় বরণ করে নিচ্ছেন তাঁর প্রেয়সী মৃত্যুকে, করালী মেডুসাকে। ১৭ এপ্রিলের দিবাগত রাত ১ টা ১৫ মিনিট, দিনপঞ্জিকার হিসাবে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে ১৮ এপ্রিল। আইনস্টাইন বুঝলেন সহসাই যবনিকাপাত ঘটতে যাচ্ছে তাঁর জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যের। তাই জার্মান বংশোদ্ভূত এই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী কর্তব্যরত নার্সকে কাছে ডেকে এনে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় অস্পষ্ট উচ্চারণে জার্মান ভাষায় বিড়বিড় করে বলে গেলেন জীবনের শেষ সংলাপ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, জার্মান ভাষা জানতেন না সেই নার্স। ফলে, কারও পক্ষেই আর জানা সম্ভব হল না জীবনের শেষ বাণীতে কী বলেছিলেন এই বরেণ্য বিজ্ঞানী।[৮]

আসলে, জীবনের শেষ উচ্চারণ কি কেউ ঠিক ঠিক বলে যেতে পারেন—পৌঁছে দিতে পারেন সত্যান্বেষী মানুষের কাছে? অথবা, বলা চলে, জীবনের চরম সত্যকে আবিষ্কার করার একান্ত সাধনায় নিয়োজিত মহৎ মানুষেরা যখন সত্যি সত্যিই একদিন সেই অনন্য অভিজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হন—পেয়ে যান সেই অন্বিষ্ট সত্যটুকু, তখন কি তাঁরা সেই অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে পারেন তাঁর সতীর্থদের বা অনুগামীদের? প্রথম দিনের সূর্য যেমন প্রশ্ন করেছিল সত্তার নতুন আবির্ভাবে, তেমনই প্রশ্ন করেছিল দিবসের শেষ সূর্যও—কে তুমি? কিন্তু, উত্তরহীনই থেকে গেছে সেই দীপ্র প্রশ্ন। অথবা প্রার্থিত সে উত্তর যদি পেয়েও থাকেন—তা আর আমাদের জানা হয়ে ওঠে না। কারণ, সেই শেষ সত্য বা অভিজ্ঞতার কথা আর বলে যেতে পারেন না সত্যলব্ধ ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি সেই তিনটি পতঙ্গের কাহিনি—

একবার তিনটি পতঙ্গের খুব সাধ হল প্রদীপের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের। প্রথম পতঙ্গ উড়ে গেলো প্রদীপের কাছে—তবে খুব কাছে গেলো না। ফিরে এসে সে বলল, ওটা হচ্ছে আলো—ওটা উত্তাপ দেয়। দ্বিতীয় পতঙ্গ সন্তুষ্ট হল না এতে। সে উড়ে গেলো প্রদীপের আরও কাছে এবং প্রদীপের শিখায় পুড়ে গেলো

তার পাখার খানিক অংশ। অতঃপর ফিরে এসে সে বলল, ওটা দগ্ধ করে। কিন্তু, তৃতীয় পতঙ্গ তাতেও সন্তুষ্ট হল না। বলল—ওটা চূড়ান্ত সত্য নয়, আরও কিছু আছে। তাই সে উড়ে গেলো প্রদীপের কাছে—আরও কাছে এবং একেবারে অগ্নিশিখার অভ্যন্তরে। প্রদীপের শিখায় নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো পতঙ্গের ক্ষুদ্র শরীর—সে আর ফিরে আসে না। কিন্তু সে জেনে যায় যা তার জানবার ছিল—প্রদীপের প্রকৃত স্বরূপ। অথচ সেই সংবাদটি—জীবনের সেই শেষ সত্যটুকু সে আর কাউকে বলে যেতে পারেনি।[৯]

আসলেই, জীবনের শেষ সত্য আমরা কাউকেই বলে যেতে পারি না—জীবনের মঞ্চে আউড়ে যেতে পারি না প্রার্থিত শেষ সংলাপটুকু। সে জন্যই আমরা প্রতিনিয়ত জীবনের চরমতম সত্যের সন্ধানে উন্মাদের মত ছুটে ফিরি। যখন সে সত্যটুকু জেনে যাই তখন আমরা আর আমাতে থাকি না—একাত্ম হয়ে যাই সেই সত্যের সঙ্গেই। ফলে, এপারের উৎসুক জনতার কাছে—পর-প্রজন্মের কাছে আর পৌঁছানো হয়ে ওঠে না সেই শেষতম সত্যের বাণীরূপ। আর তাই, অধরা সেই সত্যের সন্ধানেই আবার শুরু হয় আর-এক জীবনের ছুটে চলা। এভাবেই চলতে থাকে জীবনের এক অনাদি-অনন্ত পথ-পরিক্রমণ।

সিলেট, ১৯৯৬

তথ্যসূত্র

১. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়; হে মহামরণ; দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৮; পৃ. ১৮৬;

২. এম. কবিরুল ইসলাম; মাস্টার দার অবদানের স্বীকৃতিই হবে তাঁর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ; দৈনিক জনকণ্ঠ; ২১.০৩.১৯৯৪;

৩. ড. আনোয়ার হোসেন; তাহেরের স্বপ্ন; ভোরের কাগজ; ২৪.০৭.১৯৯৫;

৪. এহতেশাম আজাদ পুষ্কর; চার্লস ডারউইন; অ্যানেকডটস, ভোরের কাগজ; ২৪.০৪.১৯৯৫;

৫. গোলাম ফারুক; সক্রেটিস : জীবন ও দর্শন; সংবাদ সাহিত্য সাময়িকী; ১১.০৬.১৯৯২;

৬. George Seldes; The Great Thoughts; London, 1985; P- 390;

৭. পূর্ণেন্দু পত্রী; রূপসী বাংলার দুই কবি; কলিকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ; মার্চ, ১৯৯০; পৃ. ৮৯;

৮. আলী হাবিব; মৃত্যুর ৪০ বছর পর আবারও আইনস্টাইন; দৈনিক জনকণ্ঠ; ০৫.০৯.১৯৯৫;

৯. সৈয়দ শামসুল হক; হৃৎ কলমের টানে; সংবাদ; ২৫.০৪.১৯৯১;

CamScanner

শেষ দৃশ্য : শেষ সংলাপ—দুই

মানুষ আমরা পৃথিবী নামক রঙ্গমঞ্চের এক-এক কুশীলব। আমরা এখানে নিয়তি-নির্ধারিত দৃশ্যে অভিনয় করে যাচ্ছি সারাটা জীবনভর। এবং একসময় জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যে এসে আওড়ে যাচ্ছি জীবনের শেষ সংলাপ—এক-একজন একেক ভাবে। সেই শেষ দৃশ্যের শেষ সংলাপ নিয়েই আমাদের গ্রন্থনা—'শেষ দৃশ্য : শেষ সংলাপ'। এটি এই পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব।

১

ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী এক প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি তিন-তিনবার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতিসংঘের প্রস্তাবকও তিনি। জন্ম ৩০ জানুয়ারি ১৮৮২, মৃত্যু ১২ এপ্রিল ১৯৪৫। মৃত্যুর দিন তিনি দিনের প্রাত্যহিক কাজের শেষে ঘুমোতে গেলেন নিজের শয়নকক্ষে। মাথার পেছনদিকে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছিলেন। তারপরও স্বাভাবিকভাবে ঘুমোতে যান তিনি। বিছানায় শুয়ে তিনি পরিচারকদের উদ্দেশে শুধু বললেন, 'সব বাতি নিভিয়ে দাও'। ঘুমোবার পূর্বমুহূর্তে বলা সেই কথাই ছিল আমেরিকার কিংবদন্তির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের জীবনের শেষ উচ্চারণ। ওই ঘুমের মধ্যেই তিনি নিঃশব্দে পাড়ি জমান না-ফেরার দেশে। শয়নকক্ষের সব বাতির সঙ্গেই সেদিন নিভে যায় প্রেসিডেন্টের জীবনবাতিও।[১]

২

ফিরোজ সাঁই। পুরো নাম এ কে এম ফিরোজ আলম, বাংলাদেশের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী। জন্ম ১৯৫২ সালের ১ মার্চ পিতার কর্মস্থল নীলফামারিতে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যে কজন তরুণ শিল্পী পপ সংগীতের চর্চা ও পরিবেশনার ধারা সূচনা করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর কিছু বিখ্যাত গান হল—'স্কুল খুইলাছে রে মাওলা, স্কুল খুইলাছে', 'আমি কারও বুকে আগুন', 'আমিত আমারে চিনিলাম না', 'পাসপোর্ট ভিসা লাগে না', 'পাগল হইতে চাইলেও পাগল হওয়া যায় না', 'এক সেকেন্ডের নাই ভরসা' ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি নেন। ১৯৮০ সালে শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্য বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। তারপর থেকে শিল্পকলা একাডেমির প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্যতম নেপথ্য কর্মী ছিলেন তিনি। ১৯৯৫ সালের ১২ জানুয়ারি। শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত হয়েছে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। কদিন ধরেই শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না শিল্পী ফিরোজ সাঁইয়ের। তারপরও তিনি দায়িত্ববোধ ও হৃদয়ের টানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এই আয়োজনের সঙ্গে। দুপুরে বাসায় ভাত খাওয়ার সময় তিনি তাঁর বড়ো ছেলেকে বললেন, 'বাবা, আজ রাত্রে আমি মরে যাব। আর ফিরে আসব না।' বিস্ময়করভাবে তাঁর ছেলেও শঙ্কিতকণ্ঠে বলে ওঠে, 'বাবা, তুমি যেও না। গেলে তুমি সত্যি সত্যি মরে যেতে পার।' কিন্তু সমস্ত বাধা উপেক্ষা তিনি দায়িত্ব ও সংগীতের টানে ছুটে গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানস্থলে, আর ফিরে আসেননি। বিজয় দিবসের এই অনুষ্ঠানে তাঁর গান গাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি গাইলেন এবং মাতিয়ে তুললেন দর্শকদের। একাডেমির জামতলার মুক্তমঞ্চে প্রথম গানটি গাওয়ার পর নেমে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালির সঙ্গে আরও গান গাওয়ার প্রবল অনুরোধে ঋজু দীর্ঘদেহী শিল্পী ফিরোজ সাঁই বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন, 'শরীর ভালো নেই। আর পারব না।' তারপরও দর্শকরা মানেননি। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের দাবির মুখে তাঁকে গাইতে হল আরেকটি গান। তিনি গাইলেন—'এক সেকেন্ডের নাই ভরসা/ সাজ্গা হইবে রং তামাশা/ চক্ষু মুদিলে/ হায়রে দম ফুরাইলে ...'। এ গানটি করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন তিনি। এর কিছুক্ষণ পরই সত্যি সত্যিই তাঁর দম ফুরিয়ে গেল। চিরদিনের মত চোখ বুঁজলেন শিল্পী ফিরোজ সাঁই। গান শেষ হওয়ার পর পরই গানের বাণীবদ্ধ সত্যতায় সমর্পিত হল তাঁর জীবন।[২]

৩

চে' গুয়েভারা। পুরো নাম চে' আর্নেস্টো গুয়েভারা। স্বপ্ন দেখতেন আর স্বপ্নের জোনাকি পোকাগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে কবিতা লিখতেন। শুধু মনে ও মস্তিষ্কে নয়—পেটে ও পিঠে তিনি বয়ে বেড়াতেন অবিনশ্বর স্বপ্নের সোনালি শস্যদানা। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে মিলে কিউবার বিপ্লবকে সফল করেছিলেন চে' গুয়েভারা—মন্ত্রী হয়েছিলেন ক্যাস্ট্রোর সরকারে। কিন্তু আজন্ম বিপ্লবী চে' তো এক বৃত্তাবদ্ধ জীবনের মায়ার কোনও বিপ্লবের সোনালি আমন্ত্রণকে এড়াতে পারেন না; তাই আরেকটি বিপ্লবের আহ্বানে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন বলিভিয়ার গহিন জঙ্গালে—গড়ে তুলেছিলেন অদম্য এক গেরিলা বাহিনী। ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর বলিভিয়ার ছোট্ট পাহাড়ি শহর লা হিগুয়েরা

গ্রামের একটি স্কুলঘরে বন্দি চে' গুয়েভারাকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর।

চে'র মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল পাবলো নেরুদার একটি কবিতার বই—'কান্টো জেনারেল'। চে' তাঁর ডায়েরিতে নেরুদার কবিতা 'বলিভারের জন্য গান' থেকে একটি লাইন লিখে রেখেছিলেন—'তোমার ছোট্ট মৃতদেহটা একজন সাহসী সেনাধ্যক্ষের মত'। যেন কবিতার পঙ্‌ক্তি নয়, এক স্বপ্নদ্রষ্টা কবির অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী। চে' নিজেও কবিতা লিখতেন। তাঁর স্বপ্নগুলো সোনালি মাছের মত সাঁতরে বেড়াতো তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চে' বলেছিলেন, 'আমি জানতাম, তোমরা আমাকে হত্যা করবেই। আমি জীবিত অবস্থায় ধরা না-দিলেও পারতাম। ফিদেলকে বলো—আমার ব্যর্থতার মানে এই নয় যে, বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে। অন্য কোথাও বিপ্লব জয়ী হবেই। আলিয়েদাকে (চে'র স্ত্রী) বলো, সবকিছু যেন ভুলে যায়। আবার বিয়ে করে সুখী হয় আর ছেলেমেয়েগুলোকে যেন মানুষ করে তোলে। আর তোমাদের সৈন্যদের বলো, যেন লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছোঁড়ে।'[৩]

৪

গারট্রুড স্টেইন, মার্কিন সাহিত্যিক। কথিত আছে যে, বিশিষ্ট মার্কিন সাহিত্যিক গারট্রুড স্টেইন তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সমবেত সকলের কাছে জানতে চান—'What is the Answer?' কোনও উত্তর এলো না। তখন তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'In that case, What is the Question?' তারও কোনও উত্তর আসেনি, কিন্তু তার একটু পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪]

৫

প্রিন্সেস ডায়ানা। প্রিন্সেস অব ওয়েলস বা লেডি ডায়ানা নামেই সমধিক পরিচিত। জন্ম ১ জুলাই ১৯৬১, মৃত্যু ৩১ আগস্ট ১৯৯৭। ১৯৮১ সালে বিয়ে হয় ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে। রূপ, খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের কারণে তিনি ছিলেন তৎকালে সারা বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত নারী। চার্লসকে বিয়ে করার পর তাঁদের ঘরে দুসন্তানের জন্ম হলেও বিবাহিত জীবনে এক অন্ধকার কালো মেঘ ছায়া মেলে দিয়েছিল। এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর পুত্র ডোডি আল ফায়েদের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাঁর জীবন নিয়ে কৌতূহল ছিল অনেকেরই। 'পাপারাজ্জি'রা সবসময় তৎপর ছিল ডায়ানা-জীবনের গোপন তথ্য সংগ্রহে। ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট বন্ধু ডোডি আল ফায়েদকে নিয়ে যখন লং ড্রাইভে ছিলেন এবং ডায়ানাদের গাড়ি যখন প্যারিসের সিন নদীর টানেলের ভেতর দিয়ে চলছিল তখনই পাপারাজ্জিদের ধাওয়ার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডায়ানাদের গাড়ি একটি পিলারে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হন। গাড়িতে বন্ধু ডোডি ছাড়াও

CamScanner

ছিলেন ডায়ানার দেহরক্ষী এবং ড্রাইভার পল। দুর্ঘটনায় অকুস্থলেই মৃত্যুবরণ করে ডায়ানার বন্ধু ডোডি ও ড্রাইভার পল। ডায়ানাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দুর্ঘটনার পরপর যখন গাড়ি থেকে আহতদের উদ্ধারকাজ চালাচ্ছিলেন এক ডাক্তার তখনই ডায়ানা ফিস ফিস করে বলেছিলেন—'আমাকে একা থাকতে দাও, আমাকে একা থাকতে দাও।' এরপরই চেতনা হারান তিনি—যা আর কখনও ফিরে আসেনি।[৫]

৬

জীবনানন্দ দাশ। আধুনিক বাংলা কবিতার এক অনিবার্য নাম। জীবিতকালে উপেক্ষিত ছিলেন, ছিলেন অবজ্ঞাত। কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে বরিশালের ধানসিঁড়ি নদীর তীরে। মাতা কুসুমকুমারী দাশও ছিলেন কবি। তাঁকে কেউ কেউ বলেন 'নির্জনতম কবি', আবার কেউ বলেন শুদ্ধতম কবি। সারাটা জীবন সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন জীবন ও জীবিকার জন্য। জীবন সম্পর্কেও কেমন নিস্পৃহ ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখে কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হলে ভর্তি করা হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। অনেকের চেষ্টায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। দুর্ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পর ২২ অক্টোবর তারিখে রাত ১১টার দিকে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দুর্ঘটনার পর প্রায় সারাক্ষণই অচেতন ছিলেন। মৃত্যুর আগমুহূর্তে একবার শুধু জীবনানন্দ কথা বলে ওঠেন। তখন কবির কাছে ছিলেন ডাক্তার দিলীপ মজুমদার। তাঁর সাক্ষ্য অনুযায়ী জীবনানন্দ দাশের শেষ সংলাপ ছিল—'ধূসর পাণ্ডুলিপির রং সারা আকাশ জুড়ে, ধূসর পাণ্ডুলিপি সারা আকাশ জুড়ে।'[৬]

৭

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। পুরো নাম মির্জা মুহাম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলা। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন তিনি। কিন্তু নিজ আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়ভাজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশির ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হন সিরাজ। পালিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। পথিমধ্যে ধরা পড়ে বন্দি অবস্থায় আনা হয় মুর্শিদাবাদে। তারপর মিরজাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ হত্যা করে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে।

মুর্শিদাবাদে আনার পর বন্দি সিরাজ দেখেন খোলা তরবারি হাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই একান্ত বাধ্যগত অনুচর মোহাম্মদী বেগ। বিস্মিত নবাবের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, 'মোহাম্মদী বেগ, তুমি! তুমিও আমাকে বাঁচতে দেবে না?' মোহাম্মদী বেগ অসহায়ের মত কেবল বলল, 'আমি নই, তারা দেবে না'।

CamScanner

সিরাজের বুঝতে বাকি থাকলো না কে এই 'তারা'? নবাব বললেন, 'মোহাম্মদী বেগ, আল্লার সান্নিধ্যে যাওয়ার আগে আমাকে অন্তত দুরাকাত নামাজ আদায় করার সুযোগ দাও।' কোনও জবাব নেই, মৌন হয়ে রইলেন মোহাম্মদী বেগ। সিরাজ সেজদায় গেলেন। এসময় দূরে বাঁশির সংকেত বেজে উঠল। সেজদারত অবস্থায় নবাবের পিঠে তরবারি চালালেন মোহাম্মদী বেগ। লুটিয়ে পড়লেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। তাঁর মুখ থেকে শুধু অস্ফুটে বেরিয়ে এলো, 'আল্লাহ, তুমি ক্ষমা করো।' তারপর সব শেষ।[৭]

৮

ওস্কার ওয়াইল্ড। আইরিশ কবি ও নাট্যকার। জন্ম ১৬ অক্টোবর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৯০০ সালের ৩০ নভেম্বর। বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ আওড়ানো একটি দুর্লভ আর্ট। ওস্কার ওয়াইল্ড বিখ্যাত ছিলেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও কথা বলার জন্য। তাঁর নাটকগুলো লন্ডনে ব্যাপক প্রচারের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন লন্ডনের সবচেয়ে খ্যাতিমান নাট্যকার। জীবননাটকের বিভিন্ন দৃশ্যেই শুধু নয়, জীবনের একেবারে শেষ দৃশ্যেও শেষ সংলাপ হিসেবে এক বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চারণে তিনি চমকে দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বকে।

নাট্যকার ওস্কার ওয়াইল্ড গুরুতর অসুস্থ। শুয়ে আছেন হাসপাতালের বেডে। কিন্তু তিনি যে কক্ষে শুয়ে ছিলেন তার পর্দাগুলো ছিল কিছুটা মলিন ও পুরোনো। এ-কারণে কিছুটা বিরক্ত ছিলেন ওস্কার ওয়াইল্ড। তাই তিনি সেবিকাদের ডেকে বললেন, 'হয় এই পর্দাগুলো যাবে, নয় আমি' (আইদার দোজ কার্টেনস গো অর আই ডু)। এটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ সংলাপ। কারণ, এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। আর এক জরিপে তাঁর এ শেষ সংলাপটিই নির্বাচিত হয়েছে ব্রিটেনের সেরা 'উইট' হিসেবে।[৮]

৯

নস্ট্রাদামুস। এক রহস্যময় ভবিষ্যদ্‌বক্তা। প্রকৃত নাম মিশেল দে নটরডেম। পড়াশোনার পাট সমাপ্তির পর নিজের নাম লাতিন ভার্সন করে রাখেন নস্ট্রাদামুস এবং এই নামেই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। জন্ম ফ্রান্সে ১৫০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। পড়াশোনা করেন চিকিৎসাবিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে। চিকিৎসক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে তিনি সেখানে চিকিৎসাকাজে নিজেকে নিয়োজিত করতেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি সফলভাবে মহামারি প্রতিরোধে সক্ষমও হতেন। তবে একবার এরকম একটি মহামারি উপদ্রুত এলাকায় চিকিৎসা সেবাকাজে যখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তখন নিজের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। এই ঘটনা নস্ট্রাদামুসকে খুব বিচলিত করে। এক পর্যায়ে তিনি রাতে বসে ধ্যান করা

CamScanner

শুরু করেন। ধ্যানের মধ্যেই তিনি তন্দ্রায় চলে যেতেন এবং তখন তাঁর স্বপ্নের ভেতর ছবির মত ভেসে উঠত ভবিষ্যতের কথা। তিনি সেগুলোই লিপিবদ্ধ করে পঞ্জিকার মত প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৫৫০ থেকে ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত এ-জাতীয় বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশ করেছেন তিনি, যেখানে বর্তমান রাশিফলের মত করে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন। সেখানে মানুষের শুভ-অশুভ, প্রেম, বিরহ, সন্তান ভাগ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হেঁয়ালি করে ভবিষ্যদ্‌বাণী লেখা থাকত। এগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

১৫৫৪ সালে তিনি *Centuries* লেখা শুরু করেন। সেখানে তার 'ভিশন' বা স্বপ্নগুলো হেঁয়ালি করে লেখা ছিল। সাত খণ্ড লেখার পর সেগুলো ১৫৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। সেখানে ৩৫৩টি ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। পরে এরকম আরও ভবিষ্যদ্‌বাণী লিখতে থাকেন। তবে সেগুলো যেন মৃত্যুর আগে প্রকাশিত না-হয়, এ-ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যান। ১৯৫৮ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর, ৯৪১টি ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয় *The Prophecies.* নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলে। এর পক্ষে বিপক্ষে নানা কথা হয়। তবু তিনি এক রহস্যময় ভবিষ্যদ্‌বক্তা হিসেবে এখনও সারা বিশ্বেই সমান আলোচিত।

১৫৬৬ নস্ত্রাদামুসের বাতের ব্যথা বেড়ে যায়। জুনের শেষ দিকে তিনি একজন উকিল ডেকে আনেন এবং তাঁকে দিয়ে তাঁর সম্পত্তির একটি উইল করিয়ে নেন। কথিত আছে, ১ জুলাই তারিখে তিনি তাঁর সেক্রেটারি জ্যঁ দ্য শাভিঁ কে ডেকে বলেন, 'আগামীকাল সূর্যোদয়ের সময় আমাকে জীবিত পাবে না।' এরপর তিনি ঘুমোতে যান। পরের দিন সকালে রহস্যময় ভবিষ্যদ্‌বক্তা নস্ত্রাদামুসকে তাঁর বিছানার পাশে মেঝেতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।[৯]

১০

ভলতেয়ার। প্রকৃত নাম ফ্রঁসোয়া-মারি আরুয়ে। তবে ভলতেয়ার নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। জন্ম ২১ নভেম্বর ১৬৯৪ এবং মৃত্যু ৩০ মে ১৭৭৮। ফরাসি আলোকময় যুগের একজন লেখক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। তাঁকে অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফরাসি সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক বিবেচনা করা হয়। আবার কারও কারও মতে তিনি শতাব্দীর মহত্তম কবি ও নাট্যকার। বাকচাতুর্য এবং দার্শনিক ছলাকলার জন্য তিনি সুবিদিত ছিলেন। তিনি নাগরিক স্বাধীনতার পক্ষে, বিশেষত ধর্মের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের কঠোর সেন্সর আইন উপেক্ষা করে সামাজিক সংস্কারের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রিস্টান গির্জা এবং তৎকালীন ফরাসি সামাজিক আচার ছিল তাঁর

ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্য। তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে দুই হাজার গ্রন্থ এবং বিশ হাজার চিঠি। বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক হিসেবেও তাঁর বেশ সুখ্যাতি আছে। ব্যঙ্গাত্মক কিছু রচনার জন্য তাঁকে এক বছর বাস্তিল দুর্গে বন্দি থাকতে হয়। ভলতেয়ার ছিলেন 'ফিলোসফিস' নামে অভিহিত একটি ফরাসি সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর নেতা, মুখ্য সংগঠক ও প্রচারকর্তা। এ গোষ্ঠীই ফ্রান্সে মুক্তবুদ্ধি ও সংস্কারযুগের স্রষ্টা বা প্রবর্তক; ফরাসি বিপ্লবে এর চিন্তা ও রচনার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৭২৬ সালের পর ভলতেয়ার ইংল্যান্ডে তিন বছরের নির্বাসনজীবন বেছে নেন।

ভলতেয়ার যখন অসুস্থ এবং শেষ শয্যায় তখন যাজকেরা ধর্ম এবং গির্জার বিরুদ্ধে তাঁর কৃত নানা অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানালে তিনি মৃদুকণ্ঠে বলেন—'শত্রু তৈরির সময় এটা না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ উচ্চারণ।[১০]

সিলেট, ২০১৮

তথ্যসূত্র

১. এহতেশাম আজাদ পুষ্কর; ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট; অ্যানেকডটস; ভোরের কাগজ, মেলা, ০৫.০২.১৯৯৬;
২. হাসনাইন খুরশেদ; 'এক সেকেন্ডের নাই ভরসা, সাঙ্গ হইবে রং-তামাশা'; দৈনিক জনকণ্ঠ; ১৮.১২.১৯৯৫;
৩. শিবব্রত বর্মণ; অমর বিপ্লবী চে'—'আমাকে হত্যা করলেই বিপ্লব মরে যাবে না'; ভোরের কাগজ; ২৩.০৭.১৯৯৭;
৪. ওবায়েদ-উল-হক; রাজনীতি যখন যুক্তিবর্জিত ও শক্তিচালিত; দৈনিক জনকণ্ঠ; ২৭.০২.১৯৯৫;
৫. ভোরের কাগজ; ১১.০৯.১৯৯৭;
৬. হরিশংকর জলদাস; জীবনানন্দ দাশ এবং যুগান্তর সাহিত্য, ৭ মার্চ, ২০০৩;
৭. আরিফুল হক; অভিশপ্ত ২৩শে জুন, অভিশপ্ত পলাশী; দৈনিক সিলেটের ডাক; ২০.০৬.২০০৭;
৮. অন্য আলো; প্রথম আলো সাময়িকী; ০২.১১.২০০৭;
৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ; রোয়ার বাংলা ব্লগ; ১৩.০২.২০১৮;
১০. উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।

CamScanner

এপিটাফ সাহিত্য

'এপিটাফ'—গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত এই ইংরেজি শব্দটির সাধারণ অর্থ 'কবরের ফলকগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি বা শব্দগুচ্ছ'। বাংলায় এটিকে কেউ কেউ 'ফলকলিপি' বা 'সমাধিলিপি' বলে থাকেন। তবে 'এপিটাফ' শব্দটিই বহুলব্যবহৃত বিধায় আমি ফলকলিপি বা সমাধিলিপি না বলে এই নিবন্ধে 'এপিটাফ' কথাটিই ব্যবহার করছি। সাধারণত কবরের ফলকগাত্রে মৃতের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা জীবনবৃত্তান্ত লেখা হয়ে থাকে। তবে কোনও কোনও কবরফলকে সাধারণ তথ্যাবলির অধিক কিছু কথা, কবিতার কোনও অংশ বা এমন সব বিষয় বা শব্দগুচ্ছ গ্রথিত থাকে যার একটি সাহিত্যমূল্য আছে। এভাবেই 'এপিটাফ সাহিত্য' এ বিষয়টির জন্ম। সাধারণভাবে 'এপিটাফ' বা 'এপিটাফ সাহিত্যে'র ব্যাপারটি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিজাত। পাশ্চাত্যে কবর সংরক্ষণ এবং কবরফলক তৈরি করে সেখানে মৃতের সাধারণ তথ্যাবলি থেকে শুরু করে বিশেষ কথামালা বা রচনা উৎকীর্ণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচ্যে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে, কবর স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার সামর্থ্য যেমন অনেকেরই নেই, তেমনই যাদের আছে তাদের মধ্যেও কবরফলক তৈরি করে কিছু লেখার প্রচলন খুব একটা নেই। আর বিশেষ কিছু ধর্মাবলম্বী, যারা মৃতদেহ দাহ করে সৎকার করে থাকেন, তারা সাধারণত কোনও স্মৃতিচিহ্ন রাখেন না। তারপরও বিশিষ্টজন অনেকের ক্ষেত্রে সৎকারস্থান সংরক্ষণ করে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার প্রবণতাও আমরা লক্ষ করে থাকি। এভাবেই আমাদের এই অঞ্চলেও এপিটাফ বা এপিটাফ সাহিত্যের বিস্তার ঘটেছে।

এপিটাফ বা এপিটাফ সাহিত্য সম্পর্কে আমার তেমন কোনও ধারণা বা আগ্রহ ছিল না। আমার কাছে এপিটাফ রচনার ব্যাপারটি কেবল বিত্তবান আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের শখের একটি বিষয় বলে মনে হত। সেসময় ১৯৮৪ সালে এপিটাফ বিষয়ে একটি কবিতা লিখি আমি। তখন সমাজে, আমাদের চারপাশে, মূল্যবোধের নানা অবক্ষয় মানবতাকে নানাভাবে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। তাই দেখে বিষাদিত কবি লিখেছিল—

'এই পৃথিবীতে আজ আর ভালোবাসা নেই

হৃদয়জ কোনও উচ্চারণ নেই
মানবিক মূল্যবোধ নেই
কোনও মানুষের মৃত্যুতে কারও বিষাদিত বিলাপও নেই।
এখানে এখন আলোহীন দিবসেরা কেবল
গোপন মন্ত্রণা করে অন্ধকারের সঙ্গে।'

সমাজের একজন নিরীহ-নগণ্য সদস্য হিসেবে আমি নিজের ভবিষ্যৎহীন ভবিষ্যৎ নিয়েও খুব শঙ্কিত ছিলাম। তাই ওই কবিতার শেষ অংশে আমি লিখি—

'আমি জানি
একদিন আমার অবহেলিত মৃত্যুতে
কোনও অশ্রুর প্লাবন বইবে না
কারও বিষাদিত বিলাপ বা দীর্ঘশ্বাস
গ্রীষ্মের খর বাতাসকে ভারাতুর করবে না
কোনও কবি রচনা করবে না এক পঙক্তি শোকগাথা।
আমাকে তাই, নিজেকেই, রচনা করে যেতে হবে আমার এপিটাফ।'

বলেছি তো ঠিকই, কিন্তু নিজের এপিটাফ কখনও রচনা করিনি বা এ-নিয়ে তেমন ভাবনার অবকাশও পাইনি। তবে একদিন সাধারণ একটি কবরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি বা এপিটাফ আমাকে বেশ নাড়া দেয়। আমি তখন থেকেই এপিটাফ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠি। ঘটনাটা খুলেই বলা যাক। সময়টা আশির দশকের একেবারে শেষ দিক। কর্মসূত্রে সিলেটের হজরত শাহজালাল (র.)-এর দরগার পেছন দিক দিয়ে আমাকে প্রায় প্রতিদিনই যাতায়াত করতে হত। দরগার পেছন দিকে কিছুটা জায়গা জুড়ে অনেক কবর ছিল, যার মধ্যে বেশ কিছু কবর ছিল বাঁধানো আর বাকিগুলো কাঁচা। একদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কাঁচা এবং কিছুটা অবহেলিত একটি কবরের দিকে আমার চোখ যায়। সেখানে একটি বাঁশের খুঁটির উপর বাঁধা টিনের প্লেটের ওপর উৎকীর্ণ যে এপিটাফ, তাতে লেখা ছিল—

'কবরের ভেজামাটি একদা শুকায়
ভোলা তারে যায় না যে অকালে হারায়।'
মাহবুবুর রহমান (পারভেজ),
জন্ম—২৫ অক্টোবর ১৯৭৫, মৃত্যু—১১ মার্চ ১৯৮৮।

মাহবুবুর রহমান পারভেজ কে ছিলেন আমি জানি না। তবে প্রকৃত অর্থে সে অকালেই হারিয়ে গিয়েছিল এই পৃথিবী থেকে; মাত্র ১২/১৩ বছরের এক সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে। এই তথ্য আমাকে কেমন এক বিষণ্ন বেদনাবোধে আক্রান্ত

CamScanner

করে। এই বিষাদিত বিষয়ের পাশাপাশি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী কবিতার দুটো লাইন আমাকে সেদিন প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দেয়। আমি সেদিনই বুঝতে পারি এপিটাফ কীভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে। আর তখন থেকেই আমি এপিটাফ বা এপিটাফ সাহিত্য নিয়ে নানাভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করি। এরই কিছু অংশ নিয়ে আজ আমি সাজিয়েছি আমার এই নিবন্ধের ধূসর ক্যানভাস। অবশ্য এরও বেশ আগে আরেকটি ফলকলিপি আমাকে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমি হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমাদের কলেজের শহিদমিনারটি প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মিনারের কালো বিশাল ফলকটির গায়ে উৎকীর্ণ ছিল কবিতার দুটি লাইন—

'দাঁড়াও পথিকবর, হের একটিবার
হেথা ঘুমায়ে রয়েছে সন্তান মোর মা'র।'

যতবার ওই মিনারের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম, একটু সময় হলেও দাঁড়িয়ে থেকে অদ্ভুতভাবে হৃদয়কে আন্দোলিত করা ওই লাইন দুটি পড়তাম আর ভাবতাম সত্যি বুঝি আপন মাতৃভাষার জন্য জীবন দেওয়া আমার মায়ের প্রিয় সেই সন্তানেরা ঘুমিয়ে আছে এই মিনারের পাদদেশে। এক অন্তর্গত শ্রদ্ধার অঞ্জলি গোপন প্রপাতের মত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে অন্তহীন প্রবাহে ছুটে যেত পবিত্র সেই মিনারের উদ্দেশে। জানি, সেটি সেই অর্থে কোনও এপিটাফ ছিল না, তবু সেই বাণীর অপরূপ ব্যঞ্জনা আমাকে আন্দোলিত করতো প্রতিনিয়ত।

এপিটাফ সাহিত্য নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করার প্রথম পর্যায়ে যাঁর এপিটাফ আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল তা ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের। বাহাদুর শাহ জাফরকে আমরা একজন স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধা হিসেবে যেমন জানি, তেমনই জানি একজন খ্যাতিমান কবি হিসেবেও। মহাকবি গালিব ছিলেন তাঁর অন্যতম সভাকবি। বাহাদুর শাহ জাফরের একটি কবিতার অংশবিশেষ নিম্নরূপ—

'ম্যায়নে পুছা ক্যা হুয়া ওহ্ আপ্‌কা
হুসন-ও-শবাব
হাস্‌কে বোলা ওহ্ সনম্, শানে খুদা থী,
ম্যায় নহ থা।'

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা অনুবাদে এটির অর্থ দাঁড়ায়—'তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ সৌন্দর্য ও যৌবন কোথায় গেল? শুনে সে সুন্দরী হেসে বলল, ওসব ছিল খোদার মহিমা, আমার নয়।' এই শেষ মোগল সম্রাট ব্রিটিশ রাজত্বে ছিলেন ক্ষমতাহীন পেনশনভোগী এক সম্রাট মাত্র। তারপরও তিনি

CamScanner

মনেপ্রাণে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করতেন। এমনকী বেগম জিনাত মহলও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের 'সিপাহিবিদ্রোহ' নামে খ্যাত স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহিবিদ্রোহ শুরু হলে বিদ্রোহীরা ১২ মে তারিখে বিশ হাজার লোকের সমাবেশে বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের সার্বভৌম সম্রাট বা বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৮৫৭ সালের ২০ সেপটেম্বর মাত্র ৫ দিনের যুদ্ধে পরাভূত হয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা দিল্লি থেকে সরে দাঁড়ায়। বন্দি হন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ও তাঁর পরিবারবর্গ। শাহজাদা মির্জা খিজির সুলতান ও মির্জা মুঘল এবং বাদশাহ্‌র পৌত্র আবু বকরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮৫৮ সালে এক প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে বাহাদুর শাহ জাফরকে বর্তমান মিয়ানামারের রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। তিন বছরের এক মর্মান্তিক মানসিক যন্ত্রণা ও মানবেতর জীবন শেষে ১৮৬১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন তিনি। রেঙ্গুনের ঘোড়দৌড় মাঠের এক কোণে কবর দেওয়া হয় সম্রাট ও তাঁর বেগম জিনাত মহলকে। কবরগাত্রে এপিটাফ হিসেবে শোভিত আছে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর রচিত একটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি—

'এ্যাতনা বদনসীব হ্যায় জাফর
দাফনকে লিয়ে দোগজ জমি
না মিলি কুঁয়ে ইয়ার মে।'

যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়—'তোমার এতই দুর্ভাগ্য জাফর যে কবর দেওয়ার জন্য বন্ধুদের পাশে দুই গজ জমিও পেলে না তুমি।' একবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মিয়ানমার সফরের সময় বাহাদুর শাহ জাফরের কবরের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। সম্রাটের কবরগাত্রে শোভিত এপিটাফ পাঠ করে রাজীব গান্ধীও এক প্রস্থ কবিতা রচনা করেন, যার মর্মার্থ ছিল এরকম—'হে ভারতের উজ্জ্বল রবি! হে স্বাধীনতার চিরন্তন সৈনিক, তোমার মৃত্যু নেই। তুমি ভারতের শান ও শওকতের মধ্যে চিরঞ্জীব আছো।'

শেষ মোগল সম্রাটের এপিটাফ নিয়ে যখন আলোচনা হল তখন আরেক বিখ্যাত মোগল সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারার এপিটাফটিও এখানে উল্লেখ করা ভালো। জাহানারাও একজন কবি ছিলেন। প্রখ্যাত সাধক নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিপার্শ্বেই সমাধিস্থ করা হয় জাহানারাকে। নিচে দেওয়া হল এপিটাফ হিসেবে তাঁর কবরগাত্রে উৎকীর্ণ স্বরচিত কবিতার পঙ্‌ক্তিটি—

'বেগায়র সব্‌জা না পোশাদ কসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গড়িবান্ হামিন্ গিয়াহ্ বসন্ত।'

বাংলা অনুবাদে এই কবিতার পঙক্তি দাঁড়ায় এরকম—'একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির ওপর। আমার মত দীন অভাজনের সে-ই শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন।' মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের এপিটাফ-বাণীতে কী তীব্র হাহাকার, অপ্রাপ্তির বেদনা আর কী করুণ আর্তি! অন্যদিকে আরেক মোগল সম্রাটের তনয়া জাহানারার জীবনেও অপ্রাপ্তির সুতীব্র বেদনা ছিল, তবু তাঁর স্বরচিত এপিটাফ-বাণীতে কী বিনীত আবেদন—সম্পূর্ণ সমর্পণের কী দীন আকুতি! কিন্তু সেখানেও কি প্রচ্ছন্নভাবে এক বিষাদিত বেদনার হাহাকার আমরা শুনি না?

আনারকলি, ইতিহাসের বিখ্যাত প্রেমোপাখ্যানগুলোর অনন্য প্রধান এক চরিত্র। বিখ্যাত মোগল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রেমিকা আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। লাহোরে অবস্থিত তাঁর কবরগাত্রে লেখা আছে—

'একবার যদি আমার প্রেয়সীকে দেখতে পেতাম
ধ্বংসের দিন পর্যন্ত আমি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম।'

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার সংশ্লিষ্ট অনেকের মতে আনারকলির কবরগাত্রে উৎকীর্ণ এপিটাফের এই বাণী জাহাঙ্গীরেরই লেখা।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের এপিটাফটিরও উল্লেখ করা আবশ্যক। এক ধরনের বিষণ্ণতার মাধুর্যমণ্ডিত এই এপিটাফে লেখা আছে—

'বার মাজারে বা গরিবান
না চেরাগে না গুলে
না পোড়ে পরওয়ানা না সাদদ
না সাতায়ে বুলবুল।'

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায়—

'গরিব গোরে দীপ জ্বেলো না
ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে
শামা পোকার না পোড়ে পাখ
দাগা না পায় বুলবুলে।'

মোগল সাম্রাজ্য থেকে এবার চোখ ফেরানো যাক বিশ্বের অন্যান্য দিকে। পৃথিবী বিখ্যাত অনেক সম্রাট, বিশ্ববিজয়ী নেতা, প্রেসিডেন্টের সমাধিফলকেও এপিটাফ উৎকীর্ণ আছে। সেগুলো থেকেই এখানে চয়িত হল কয়েকটি। কখনও কখনও আমরা এপিটাফের পঙক্তিমালায় কাব্যগুণসম্পন্ন রচনা দেখি, কখনও দেখি

CamScanner

বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ, আবার কখনও-বা কৌতুক বা হাস্যরসের উপস্থিতিও আমরা লক্ষ করি। এপিটাফে অনেক সময় ইতিহাসের বিস্মৃত নায়কদের খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের সম্পর্কে অনেক তথ্য তুলে ধরে এপিটাফ। যেমন, খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে মিসরে ফারাও এমেনেমহেটের এপিটাফে লেখা হয়েছিল—

> '...he restored that which he found ruined; that which a city had taken from its neighbour; while he caused city to know its boundary with city, establishing their landmarks like the heavens, distinguishing their waters according to what was in the writings, investigating according to that which was of old, because he so grately loved justice.'

সামান্য কিছু কথায় একজনের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বা বিশেষ গুণাবলির সুস্পষ্ট প্রকাশ যে ঘটানো যায়, এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডারের এপিটাফ। সেখানে লেখা আছে—

'এখানে এই মাটির ঢিপি যাকে রেখেছে ঢেকে
তার জন্য পৃথিবীটা খুব বড়ো ছিল না।'

কর্সিকার রাজা থিওডোরের এপিটাফ তৈরি করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোল। লেখা হয়েছিল তাঁর এপিটাফে—

> 'এখানে শুয়ে আছেন কর্সিকার রাজা থিওডোর
> যিনি মারা গিয়েছিলেন এই গির্জায় ১১ ডিসেম্বর ১৭৫৬ সালে।
> কর্সিকার রাজ্য দিয়ে তিনি দায় মিটিয়েছিলেন পাওনাদারদের
> কিংস বেঞ্চ প্রিজন থেকে তাই মুক্তি পেয়েছিলেন
> ইনসলভেন্সি আইনের সাহায্যে এবং তারপর
> পরলোকগমন করেছিলেন এখানে।'

আর তারপরই দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশে দুলাইন লিখেছিলেন কবিতাকারে—

> 'কবর—একজন মহান শিক্ষক,
> যে ভিখারি, দাস এবং রাজাকে নিয়ে আসতে পারে একই পর্যায়ে।'

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সমাধিগাত্রে এপিটাফ হিসেবে যে বাণী উৎকীর্ণ আছে, তা একজন দেশপ্রেমিক মহান রাজনীতিকের জন্য খুবই উপযোগী। সেখানে লেখা আছে—

'দেশ তোমাকে কী দিলো সেটা বড়ো কথা নয়,

দেশকে তুমি কী দিলে সেটাই বড়ো।'

আর প্রচলিত অর্থে রাজাবাদশা না হয়েও যিনি জনগণের হৃদয়ের রাজা সেই ইয়র্কশায়ারের রবিনহুডের কবরে এপিটাফ হিসেবে কী লেখা আছে, দেখা যাক। ২৫ ডিসেম্বর ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দের তারিখ-অঙ্কিত এই এপিটাফটিতে লেখা আছে—

'Here Undernead this latil stean
Laiz Robert Earl of Huntingdon
Nea arcir ver az hie sa geud,
An pipil Kauld him Robin Heud.
Sich at laz az he an iz men
Vil England nior si agen.'

বাংলা ভাষান্তরে এর অর্থ দাঁড়ায়—'এখানে শুয়ে আছে হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট। তিনি ছিলেন এতই ভালো যে সবাই ডাকতো তাকে 'রবিন হুড' বলে। এমনই লোক ছিলেন তিনি যে ওই রকম কাউকে আর দেখবে না ইংল্যান্ড।'

এপিটাফ রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন কবি-সাহিত্যিকেরা। আর এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের কবি-সাহিত্যিকেরাই। শেকসপিয়রকে দিয়েই শুরু করা যাক। স্ট্র্যাটফোর্ড আপন এ্যাভনে ইংরেজি সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট শেকসপিয়রের কবরগাত্রে শোভিত এপিটাফটি কাব্যময়তার পাশাপাশি বেশ মজারও। সেই এপিটাফে লেখা আছে—

'Good friend, for Jesu's sake forbeare
To digg the dust enclosed heare;
Blessed be ye man yt Spares these stones,
And curst be he yt moves my bones.'

বাংলা ভাষান্তরে এরকম—'হে বন্ধু, যিশুর দোহাই, এখানে রক্ষিত ধূলি তুলে নিতে চেয়ো না; এই সমাধির পাথর তুলে নে'য়া থেকে যিনি বিরত থাকবেন তাঁর ওপর বর্ষিত হোক ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আর যে নিয়ে যাবে আমার হাড় সে হোক অভিশপ্ত।' নিজের পাহাড়প্রমাণ জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনায় রেখেই হয়ত শেকসপিয়র এই এপিটাফ রচনা করেছিলেন।

আর কবি জন ডান নিজের কবিত্ব-প্রতিভার ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি তাঁর এপিটাফে লিখে গিয়েছিলেন—

'Reader, I am to let thee know,
Donnie's body only lies below;
For, could the grave his soul comprise
Earth would be richer than the skies.'

CamScanner

বাংলা অনুবাদে আমরা পাই—'পাঠক, আপনাকে শুধু এইটুকু রাখছি জানিয়ে, যে এই সমাধির নিচে যা রক্ষিত তা ডালের শরীর মাত্র। যদি এই সমাধিতে তাঁর আত্মা থাকত তবে আকাশের চেয়েও এই ধরণি হত গরীয়ান।'

কবিদের এপিটাফ যে সবসময় কবিতার মত করে রচিত, তা কিন্তু নয়। যেমন, কবি বায়রনের এপিটাফ ছিল নিতান্তই গদ্যময়। অবশ্য কবি বায়রনের কবরগাত্রে শোভিত এপিটাফটি স্থাপন করেছিলেন তাঁর বোন অগাস্টা। সেখানে লেখা ছিল—

> 'নিচের আধারে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষ এবং মাকে সমাহিত করা হয়েছে সেখানে দেহাবশেষ রক্ষিত রয়েছে ল্যাংকাস্টার কাউন্টির রচডেলের জর্জ গর্ডন নোয়েল বায়রনের। তিনি 'চাইল্ড হ্যারল্ড পিলগ্রিমেজ'-এর গ্রন্থকার। লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি ২২ জানুয়ারি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে। পরলোকগমন করেছেন ১৮২০ সালের ১৯ এপ্রিল পশ্চিম গ্রীসের মিসোলংঘিতে—যেখানে তিনি ওই দেশের চিরন্তন স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ছিলেন যুদ্ধরত।'

নিজের এপিটাফটি নিছক গদ্যাকারে রচিত হলেও কবি বায়রন কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থায় অনেকের এপিটাফ রচনা করে দিয়েছিলেন কবিতার মত করে চমৎকার রচনাশৈলীর নিদর্শন রেখে। এরকম একটি এপিটাফ হল কবি জন. কীট্‌সের। খুবই স্বল্পায়ু এই ইংরেজ কবি মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৮২১ সালে মারা গিয়েছিলেন রোমে। সেখানে তাঁর কবরগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছিল কবি বায়রনকৃত এক লাইনের চমৎকার একটি এপিটাফ, যেখানে লেখা ছিল—

'Here lies one whose name is writ in water.'

অর্থাৎ, 'এখানে এমন একজন শুয়ে আছেন, জলের রেখায় লেখা হয়েছিল যার নাম।' কবি জন কিট্‌স খুবই স্বল্পায়ু হলেও ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের অন্যতম প্রধান প্রতিভূ হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারি, সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁর দুটি বিখ্যাত উক্তি হল—'Beauty is truth, truth beauty' (সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর), আর 'A thing of beauty is a joy forever.' (একটি সুন্দর জিনিসই চিরকালীন আনন্দের বিষয়)। যদিও অকালপ্রয়াত এই কবি অভিমান-ভরা অশ্রু আর বেদনার উষ্ণীষ পরে বিদায় নিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে; তবু জলের অক্ষরে নয়, কালের কপোলতলে তিনি এবং তাঁর সৃষ্টি স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল।

এপিটাফ সব সময়ই বিষণ্ণতার ধূসর আলো আলো ছড়ায়, বিষাদ ও বেদনার সুর ঝংকৃত করে। তারপরও অনেক সময় এপিটাফে কৌতুক, ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপের পাশাপাশি অনুতাপের আত্মগ্লানির প্রকাশও আমরা দেখি। এরকম কিছু ব্যতিক্রমী

CamScanner

এপিটাফ নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। জার্মানির ডুসেলডর্ফের খ্রিস্টান গোরস্তানে এক ব্যক্তির কবরফলকে লেখা আছে—'আমি জন্মেছিলাম বাঘের বাচ্চা হয়ে, মরে গেলাম ভেড়ার পালের ভেড়া হয়ে।' আর লন্ডন শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে খুন করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ান। বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়। মৃত্যুর আগে তিনি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নির্দেশ দিয়ে যান তার মৃত্যুর পর যেন তার স্ত্রীর কবরফলকে কিছু কথা লেখা হয়। সেই অনুযায়ী ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়ার সাত দিনের মাথায় সেই বন্ধু একজন খোদাইকারীকে দিয়ে বন্ধুর স্ত্রীর কবরফলকে লিখে দেন—'আমার যথাশাস্তি হয়েছে। আশা করি, এখন তুমি গভীর শান্তিতে ঘুমুতে পারবে।' জীবনকে নিয়ে এক ধরনের গভীর কৌতুক আর বিদ্রুপে ভরা আর একটি এপিটাফের উদাহরণ নিচে দেওয়া হল—

'Grieve not for me, my husband dear
I am not dead but sleeping here
with patience wait, prepare to die
And in short time you'll come to I.'

বাংলা ভাষান্তরে যা দাঁড়ায়—

'প্রিয় স্বামী, শোক করো না আমার জন্য
আমার তো হয়নি মৃত্যু, এখানে ঘুমিয়ে আছি মাত্র
একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করো মৃত্যুর জন্য
খুব শিগ্‌গিরই আমরা মিলিত হবো ।'

স্ত্রীর কবরগাত্রে শোভিত এই এপিটাফটির ঠিক নিচেই তাঁর স্বামীপ্রবরটি লিখলেন কৌতুকাশ্রিত ভাষায়—

'I am not grieved, my dearest wife,
Sleep on I've got another wife.
Therefore I cannot come to thee,
For I must go and live with she.'

বাংলা ভাষায় তার এই জবাবি এপিটাফের অনুবাদ করা যায় এভাবে—

'প্রিয়তমা, আমি তো করছি না শোক,
তুমি ঘুমাও, খুঁজে পেয়েছি আমি আরেক বউ
তাই পারছি না আসতে তোমার কাছে
কারণ, তার সঙ্গে তো এখন করতে হবে বসবাস।'

ঢাকার এক সময়ের বিখ্যাত নাগরিক জেজিএন পোগোসের ছেলে পল-এর এপিটাফটিও বেশ সুন্দর এবং অর্থবহ। পলের অকালমৃত্যু হয়েছিল, যার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছরের। দু লাইনের ওই এপিটাফটি এরকম—

'His sun is gone down
While it is yet day.'

আর অস্ট্রেলিয়ার এক ছোট্ট ছেলের এপিটাফে লেখা আছে—

'আমাদের ফুল—ছোট্ট নেলকে নিয়ে গেছেন ঈশ্বর
তাঁরও বোধ হয় ইচ্ছে সুগন্ধ নেওয়ার।'

শুধু মানুষের মৃত্যুতে নয়, অবোধ পশুদের মৃত্যুতেও এপিটাফ লেখার বেশ কিছু নিদর্শন আমরা পাই। একবার ফ্রান্সের ছোট্ট একটি শহরে এক নিঃসন্তান দম্পতির প্রিয় পোষা কুকুরটি হঠাৎ মারা গেলে শোকাতুরা দম্পতি তাকে কবরস্থ করে তার কবরগাত্রে লিখে রাখে—'আমরাও আসছি।' স্পেনে একসময় মালামাল পরিবহণের মুখ্য বাহন ছিল গাধা। একদিন মালাগা প্রদেশের এক গরিব দিনমজুর গাধায় করে পাহাড়ি পথে পণ্য পরিবহণের সময় গাধাটি পাহাড়ি ঢালে পা পিছলে পড়ে যায়। আহত গাধাটি কিছুদিনের মধ্যে মারা যায়। প্রিয় গাধাটিকে সমাধিস্থ করে কবরফলক স্থাপন করা হয় যেখানে লেখা হয়—'তুমি জীবিত থাকতে তোমার মর্ম বুঝিনি। এখন বুঝছি, কতো ঘাম ঝরবে আমাদের গা থেকে।' এ পর্যায়ে আরেকটি এপিটাফের প্রসঙ্গ তুলে ধরতে চাই যা নানা কারণেই যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে। একজন মার্কিন সাংবাদিক, যিনি ওহাইয়োর স্থানীয় একটি পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন; নাম জন রডরিকস। এই সাংবাদিক ভদ্রলোককে একদিন কিছু দুর্বৃত্ত ছুরিকাহত করে। তাঁর অপরাধ, তিনি ওই সব দুর্বৃত্তের দৌরাত্ম্যের কাহিনি তাঁর পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তিনমাস হাসপাতালের বেডে শয্যাশায়ী ছিলেন। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপড়া কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিলো না। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে তাঁর সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর স্ত্রীকে কিছু নির্দেশ দিয়ে যান। সেই অনুযায়ী, সাংবাদিকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী কবরফলকের গায়ে এপিটাফ হিসেবে যে কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন, তা এরকম—

'কবর শুধু মৃতের জায়গা নয়,
যারা জীবিত, কালকে তারাও এখানে আসতে বাধ্য।
কবরের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।'

CamScanner

বলা বাহুল্য, কিছু সময়ের মধ্যে ওইসব দুর্বৃত্তের সকলেই পুলিশের হাতে আটক হয় এবং বিচারে তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। সেই দণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়ার পর ভিন্ন এক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়। এবং মজার ব্যাপার হল এই দুর্বৃত্তদের প্রত্যেকের কবরফলকের গায়ে তাদের অনুতাপজর্জর আত্মীয়স্বজনেরা লিখে দিয়েছিল এই একই কথা—

'বেশ আগেই তারা কবরে এসেছে।
অপরাধ না-করলে সেখানে আসাটা আরও বিলম্বিত হতে পারতো।'

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত যুদ্ধ সমাধিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জীবন দেওয়া অনেক সৈনিকের সমাধি আছে এবং অনেকেরই সমাধিফলকে এপিটাফ হিসেবে কিছু তথ্য বা বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এগুলোর মধ্যে দুটো এপিটাফ তার সর্বজনীন আবেদনের কারণে বেশ গুরুত্ববহ। এপিটাফ দুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর শহিদানদের উদ্দেশে নিবেদিত। এপিটাফ দুটিতে লেখা আছে—

১. 'We gave our present
for your future.'
২. 'He died so that we might live.'

পাশ্চাত্যের কবি-সাহিত্যিকেরাই কেবল এপিটাফ রচনায় পারঙ্গম ছিলেন অথবা কাব্যগুণসম্পন্ন বা অর্থবহ এপিটাফ রচনা করে সাহিত্য বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। আমাদের উপমহাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্ষমতা দেখিয়েছেন এবং তাঁদের রচিত অনেক এপিটাফ অন্তর্গত সাহিত্যগুণের কারণে এপিটাফ সাহিত্য হিসেবেও কালোত্তীর্ণ হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু লাইনের যে শোকগাথাটি রচনা করেছিলেন অনেকেই তাকে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ এপিটাফ বলে বিবেচনা করে থাকেন। ওই শোকগাথায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'এনেছিলে সঙ্গে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

ঢাকার আজিমপুর পুরোনো ও নতুন গোরস্তানে অনেক কবরের গায়েই এপিটাফ হিসেবে কিছু না-কিছু লেখা আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আছে শুধু নাম আর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। ভাষা আন্দোলনের শহিদ আবুল বরকতের কবরফলকে শুধু লেখা আছে—'ভাষা আন্দোলনে শহিদ আবুল বরকত (এম.এ ক্লাস)।' প্রজ্ঞাবান অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের এপিটাফটি বেশ বিস্তারিত। কবিতার আঙ্গিকে সাজানো ওই এপিটাফে লেখা আছে—

'মরিচা, মুর্শিদাবাদ; জন্মভূমি তাঁর।
আমৃত্যু রবীন্দ্রপ্রেমে দীপ্তিমান শিখা :
প্রসন্ন পাণিনি ধ্যানে সম্পন্ন দীপিকা।
ধ্বনিতত্ত্বে কীর্তিমান একান্ত সবার
স্মৃতিমান্য; মিতবাক, সুকৃত, সুজন।
বিপুলবিত্ত-প্রাণ অধ্যাপক—যাঁর
প্রীতিকণ্ঠ বিদ্যাজ্ঞানে ঝরেছে অপার।
অনন্য ব্যক্তিত্ব স্নিগ্ধ সুস্মিত আনন।
বাংলার অমেয় কৃষ্টি সংশয়িত হলে
প্রীতিকূল-শক্তিনাশী অতন্দ্র প্রহরা
দিয়েছেন বারংবার; তবু অশ্রুতলে
বিদ্যার তীর্থ আজ শূন্যতায় ভরা;
আগন্তুক ঋতু স্বপ্নে বৃক্ষপ্রেম জ্বলে
তোমার নিশ্বাস বুঝি ফুলের পশরা?'

জন্ম : ২৬.১১.১৯১৯, মৃত্যু : ০৩.০৬.১৯৬৯

অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের কবরগাত্রে শোভিত এই এপিটাফ কে রচনা করেছিলেন, জানি না। তবে তিনি নিজে যে তা করেননি এটা নিশ্চিত। তবে অনেকেই নিজের এপিটাফ নিজেই রচনা করে গেছেন। এমনই একজন উপমহাদেশের বিখ্যাত উর্দু কবি সাদত হাসান মান্টো। তাঁর এপিটাফটি এরকম—

'য়হা সআদত হাসান মান্টো দফন হ্যায়।
উস্কে সিনেমে ফন-এ অফসানা নিগারি কে
সারে আসবার রমুজ দফন হ্যায়।
...ওহ্, অব ভি মান্টো মিট্টিকে নিচে সোচ রহা হ্যায়
কি ওই বড়া অফসানা নিগার হ্যায় ইয়া খুদা!'

সআদত হাসান মান্টো, ১৮ আগস্ট ১৯৫৪

যা বাংলা ভাষান্তরে দাঁড়ায়—'এখানে সমাহিত সাদত হাসান মান্টো। তাঁর অন্তরের সমস্ত লেখন শৈলীর তত্ত্ব এবং তথ্যও সমাহিত। তিনি এখনও মাটির স্তূপের নিচ থেকে চিন্তা করছেন যে সেই বড়ো গাল্পিক নাকি খোদা।'

বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তি-পুরুষ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের এপিটাফ বা সমাধিলিপি নানা কারণেই এক অন্যরকম বিশিষ্টতার দাবি রাখে। মাইকেলের জীবনকাহিনি খুবই বৈচিত্র্যময়। প্রথম যৌবনে ইংরেজি এবং পাশ্চাত্য

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি, যে-কারণে নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতির প্রত্যাশী হওয়া; কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাতৃক্রোড়ে ফিরে এসে মাতৃভাষার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা—এই সবকিছুই যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিশিষ্ট করেছে, তেমনই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অপরিসীম দানও তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। নিজ জন্মস্থান যশোরে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিলিপিতে এপিটাফ হিসেবে উৎকীর্ণ আছে নিচের এই স্বরচিত কবিতাটি—

'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।'

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানীর কবর আছে সিলেটের হজরত শাহজালাল (র.)-এর পবিত্র দরগাহ শরিফের মূল টিলায়। সেখানে তাঁর কবরগাত্রে পবিত্র কোরানের একটি বাণী উৎকীর্ণ আছে। আর তার নিচে লেখা আছে—

'মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী
বঙ্গবীর জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনী ওসমানী'
জন্ম : ১লা সেপটেম্বর ১৯১৮
মৃত্যু : ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

আমাদের এক প্রিয়জন শ্রদ্ধেয় কবি হবিগঞ্জের দেওয়ান গোলাম মর্তুজা। ষাটের দশকের একেবারে শেষ দিকে যখন হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন এই কবির বাসার সামনে দিয়ে প্রতিদিন পায়ে হেঁটে কলেজে যেতাম। যাওয়ার পথে কবি দেওয়ান গোলাম মর্তুজা প্রতিষ্ঠিত 'আহরণী জাদুঘর'-এর সাইনবোর্ডটির দিকে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। কোনও কোনও দিন দেখতাম ঋষিকল্প কবি দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ির সামনের লনে; কখনও কখনও কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যেত তাঁকে। দূর থেকেই দেখতাম; কাছে গিয়ে আলাপ-পরিচয়ের বা তাঁর জাদুঘরটি দেখার সাহস বা সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশের পর একদিন কী এক উপলক্ষে পরিচয় হয় কবির সঙ্গো। তারপর ঘনিষ্ঠতা। তাঁর জাদুঘর এবং একান্ত নিজস্ব লাইব্রেরিতেও বেশ কয়েকবার প্রবেশ করার সুযোগ হয়েছে। প্রচুর প্রাচীন এবং মূল্যবান গ্রন্থাদিতে সমৃদ্ধ তাঁর লাইব্রেরিটি আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছে আমার কাঙ্ক্ষিত অনেক তথ্য সংগ্রহে। তাঁর রচিত অনেক মূল্যবান বইও তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ। নিজ জন্মস্থান হবিগঞ্জের স্নানঘাটে অবস্থিত কবি দেওয়ান গোলাম মর্তুজার সমাধিক্ষেত্রে এপিটাফ হিসেবে নিজের রচিত নিচের চমৎকার কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে—

'হে পথিক,
হেরিতেছ সবুজের ভারে অবনত
আমার সমাধিপারে তৃণ-গুল্ম যত
এ জীবনে যে সবুজ স্বপন বিলাস
মিটাবারে পাই নাই দীর্ঘ অবকাশ
মরিয়াছি যত আশা ইচ্ছারাশি লয়ে
জাগিয়াছে তারাই তো তৃণ-গুল্ম হয়ে।
তোমরা বসিবে বলে এই ছায়াতলে
ভালোবাসা বিছায়েছি শ্যাম দূর্বাদলে
চলিতে চরণে যদি বিঁধে তৃণাংকুর
ক্ষমা করো বন্ধু তবে সে বিলাস মোর।'
স্নানঘাট, দেওয়ান গোলাম মর্তুজা
জন্ম : ১৯.০৭.১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০.০৬.১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

তবে আমার কাছে যে এপিটাফ বা সমাধিলিপিটি তার অন্তর্গত অর্থের ব্যঞ্জনায় এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, তা হল মরমি কবি হাসন রাজার। হাসন রাজা ছিলেন জমিদার, অনেকে বলেন প্রচণ্ড ভোগবিলাসী অত্যাচারী জমিদার। কিন্তু এক পর্যায়ে তাঁর জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসে। তিনি হয়ে ওঠেন মরমি কবি। তাঁর রচিত অসংখ্য মরমি গান ও কবিতা প্রবল জনপ্রিয়তায় প্লুত হয়ে এখনও অনুরণিত হয় মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে। সুনামগঞ্জ শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত মরমি কবি হাসন রাজার সমাধিফলকে উৎকীর্ণ আছে তাঁরই বহুলগীত একটি গানের কয়েক পঙক্তি।

'লোকে বলে, বলেরে ঘরবাড়ি ভালা নায় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার।

এই ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘরদুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।'

মরমি কবি হাসন রাজা চৌধুরী
জমিদার, লক্ষ্মণশ্রী ও রামপাশা
জন্ম : ৭ পৌষ, ১২৬১ বাংলা
মৃত্যু : ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ বাংলা।

কবিতার এই পঙক্তিগুলো কবির মতই আমাদের মনেও জন্ম দেয় জীবনের অনিত্যতা নিয়ে এক ধরনের সংশয়; ভাবনার প্রকাণ্ড হিমশৈলের মুখোমুখি হই আমরা। আমাদেরও মনে হয় 'কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার'। কিন্তু তারপরও জানি, এই জীবন সত্য—সত্য সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় বাজ্ময় আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনচর্যা। নিত্য-অনিত্যের এই যে দ্বিধা বা দ্বৈতসত্তা আমাদের কখনও কখনও থমকে দেয়। তবু, জীবনের এই দ্বৈতসত্তা নিয়েই নিরন্তর এগিয়ে চলে আমাদের অন্তহীন এ-জীবনপ্রবাহ।

সিলেট, ২০০৬

সহায়ক গ্রন্থ, সাময়িকী ও পত্রিকা :

১. মুনতাসীর মামুন; এপিটাফ; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; এপ্রিল ১৯৯১;
২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা; ০৬.০৫.১৯৯৭; ২৪.০৬.২০০৫;
৩. দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম; ০৫.১০.১৯৯৫;
৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা; ১৩.১০.১৯৯৫;
৫. স্মরণিকা; বিসিএস খাদ্য (সাধারণ) কর্মকর্তা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন, ১৯৯৬;
৬. প্রয়াস; সোনালি ব্যাংকের প্রকাশনা; নভেম্বর-জানুয়ারি, ১৯৯৪-৯৫।

অন্য এক, অন্য কেউ

প্রতিটি মানুষের দ্বৈতসত্তা থাকে—থাকে প্রতিটি মানুষেরই দুটি রূপ। তার বাইরের রূপ বা বহির্সত্তাটি আমাদের কাছে বেশি পরিচিত—ওই বহিরঙ্গাটি নিয়েই আমরা বড়ো বেশি কোলাহল করে থাকি। কিন্তু তার যে অন্তরঙ্গা রূপ বা অন্তর্সত্তা তা সাধারণত আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই আবার একটি মানুষের ওই দ্বৈতসত্তা বা দ্বিবিধ রূপের মধ্যে বিরাট বৈপরীত্য দেখা যায়। যখন অন্তরঙ্গা সান্নিধ্যে কারও অন্তর্সত্তাটি প্রতিভাত হয় আমাদের কাছে তখন প্রায়শই এ দুয়ের বৈপরীত্যের চিত্র অথবা আমাদের এতদিনকার চিরপরিচিত রূপটির বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীতধর্মী আরেক রূপের অস্তিত্ব আমাদের বিস্ময়-বিহ্বল করে। তখন আমাদের চিরপরিচিত সেই ব্যক্তি যেন কেমন অপরিচিত হয়ে যান, মনে হয় যেন তিনি আর আমাদের সেই পূর্বপরিচিতজন নন, যেন 'অন্য এক—অন্য কেউ।'

ক

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে—জমিদার বংশের রক্ত বহমান যাঁর ধমনিতে এবং যিনি নিজেও দীর্ঘদিন জমিদারিত্ব করেছেন। বাংলা কবিতাকে বিশ্ববলয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি—মানুষের শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় প্লুত হয়ে পরিচিতি পেয়েছেন 'বিশ্বকবি' হিসেবে। শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নয়—গদ্য রচনা, উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প এবং সংগীতের ক্ষেত্রেও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। সোজা কথায়, যাঁর প্রতিভার পরশমণির অপরূপ ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই পল্লবিত হয়ে উঠেছে অনন্য সব ফুলে ও ফসলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গো সঙ্গোই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে শ্বেত শুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন ঋষিকবির ছবি—একজন গুরুদেবের সমীহ জাগানো রূপ—গুরুগম্ভীর দার্শনিকের শ্রদ্ধেয় অবয়ব। কিন্তু তিনিই যে আবার সাধারণের সঙ্গো অতি সাধারণ হয়ে যেতে পারেন; সমস্ত গাম্ভীর্যের নির্মোক নিমেষে ঝেড়ে ফেলে তিনিও যে কখনও কখনও শিশুসুলভ সারল্যে চপল-চঞ্চল হয়ে উঠতে পারেন তা কিন্তু আমাদের অনেকেরই অজানা। সেরকম কিছু অন্যরকম চিত্র নিয়েই অন্য এক রবীন্দ্রনাথের এই ছবি আঁকা।

১. একবার ঠাকুরবাড়ির পাশেই কোনও এক জায়গায় গানের আসর বসেছে। বিখ্যাত গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গান গাইছেন। ঘটনাক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের পর সবাই ধরলেন রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে হবে। অগত্যা রাজি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'গোপেশ্বরের পর এবার কি তাহলে দাড়িশ্বরের পালা পড়লো?' বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ছিল লম্বা দাড়ি। সভায় হাসির রোল পড়ে গেল।

২. লম্বা দাড়ি রাখারও যে ভীষণ উপকারিতা আছে রবীন্দ্রনাথ একবার তা বিলক্ষণ টের পেয়েছিলেন। একদিন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে নিয়ে তিনি এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেছেন। খেতে বসে টের পেলেন দুজনের পাতেই দুটো পচা ডিম পড়েছে। গুরুদেব কী করেন দেখার জন্য ক্ষিতিমোহন বার বার রবীন্দ্রনাথের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। তারপর তিনি মহাবিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন যে, রবীন্দ্রনাথ নির্বিকারভাবে আস্ত ডিমটা মুখে তুলে নিচ্ছেন। তখন কী আর করা! ক্ষিতিমোহনও ভদ্রলোকের মত চুপচাপ মুখে পুড়ে নিলেন পচা ডিমটা। আর যায় কোথায়? পরক্ষণেই 'ওয়াক' 'ওয়াক' করে বমি। মেজবান তো মহাবিব্রত। পরে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরুদেব, আপনি কী করে ওই পঁচা ডিম নির্বিকারে ভক্ষণ করলেন?' মুচকি হেসে গুরুদেব বললেন, 'ওই পচা ডিম কি আমি খেয়েছিরে? খেয়েছে তো আমার দাড়ি।' 'মানে?' ক্ষিতিমোহনের বিস্মিত প্রশ্ন। হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করলেন রবীন্দ্রনাথ—'ডিমটা আস্তে মুখের কাছে উঠিয়ে দাড়ির মধ্যে দিয়ে দিলাম চালান করে জোব্বার ভিতরে। হাজার হোক, আমি হলাম গিয়ে গুরুদেব মানুষ। একটা ডিমের জন্য তো আর হইচই করতে পারি না!' ক্ষিতিমোহনের মুখে রা নেই!

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিঠে খুব পছন্দ করতেন। এটা জেনে শান্তিনিকেতনের এক ভদ্রমহিলা একবার রবীন্দ্রনাথের জন্য কিছু পিঠে নিজে বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তার বেশ কদিন পরে ভদ্রমহিলা এসে জানতে চাইলেন, 'গুরুদেব, আমার পিঠেগুলো খেতে কেমন লেগেছিল?' কবিগুরু বললেন—'সত্যি শুনতে চাও আমার মতামত?' পিঠেগুলো আসলে বেশ শক্ত ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে দুলাইন ছড়া কেটে তার মতামত জানালেন—

'লোহা কঠিন, পাথর কঠিন, আর কঠিন ইষ্টক,
তার চেয়েও কঠিন কন্যা, তোমার হাতের পিষ্টক।'

লজ্জা পেয়ে ভদ্রমহিলা একেবারে চুপসে গেলেন। কিন্তু উপস্থিত সবাই প্রাণখুলে হাসলেন।

CamScanner

৪. রবীন্দ্রনাথের এক ভৃত্যের নাম ছিল বনমালী। তার স্বাস্থ্য যেমন ছিল খুবই ভালো, তেমনই গায়ের রং ছিল কুচকুচে কালো। তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই হালকা তামাশা করতেন। একদিন দুপুরের খাওয়া সেরে রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়াদাওয়া কেমন চলছে হে বনমালী?' জোড়হাতে বনমালী হাসি হাসি মুখে বলল—'আজ্ঞে তা বেশ ভালো চলছে। দিদিমণি এখন আমাকে রোজ দুধ খাওয়াচ্ছেন।' উত্তর শুনে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুক্ষণ হেসে বললেন, 'দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন? খেয়ে তো তোমার রঙের কোনও উন্নতিই হচ্ছে না। তার চেয়ে বরং গায়ে মাখালেই তো পারতেন।'

এই রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা, এই রঙ্গ-তামাশা, পরিহাসপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের সেই চিরপরিচিতজন নন—মনে হয়, তিনি যেন অন্য এক রবীন্দ্রনাথ।

খ

হিটলার—ফুয়েরার, নাৎসি জার্মানির কর্ণধার এডল্‌ফ হিটলার; যিনি একেবারে হীন দশা থেকে আপন প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও দৃঢ়তার বলে ক্রমশ ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছিলেন সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে। কিন্তু তাঁর এই শীর্ষে উঠে আসার সমস্ত সিঁড়ি জুড়েই ছিল রক্তের দাগ; শঠতা, প্রবঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার অনপনেয় চাপ। এডল্‌ফ হিটলার—এ নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান যুদ্ধবাজ এক হিটলারের কথা—আমাদের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে গ্যাস চেম্বারের নিষ্ঠুরতা, ইহুদি নির্যাতনকারী মানবতার শত্রু এক স্বৈরশাসকের রূপ—আমাদের মনে জাগে হিংসায় উন্মত্ত এক উন্মাদপ্রায় হিটলারের ছবি। বিশেষ স্টাইলের গোঁফ শোভিত এই ছোটোখাটো মানুষটি নাৎসি জার্মানির প্রধান হিসেবে তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনে এমন কুখ্যাতিই অর্জন করেছিলেন যে, এখন তিনি শঠতা, জটিলতা ও প্রতারণার প্রতীকে পরিণত; হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে আলোচিত উপমান এখন তিনিই। কিন্তু এই বহুল পরিচিত রূপটির বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে হিটলারের আরও একটি পরিচয় ছিল। এই অন্য হিটলারটি মানবিক আবেগে, করুণায় ও রোমান্টিকতায় যেন এক অন্য কেউ—আমাদের চিরপরিচিত রূপটির বিপরীতে যেন এক অন্য হিটলার।

১. হিটলারের ব্যক্তিজীবন ছিল নিভৃত ও আড়ম্বরহীন। চা-কফি কিছুই পান করতেন না তিনি—ধূমপানও ছিল প্রবল অপছন্দের। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমৃদ্ধ ছিল না হিটলারের—পরীক্ষার ফলাফলও ছিল সবসময়ই খারাপ। কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করতেন তিনি। দর্শন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়—সব জার্মান দার্শনিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তিনি। অন্যান্য প্রিয় বিষয়ের মধ্যে ছিল ইতিহাস ও ভূগোল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ছিল তাঁর নখদর্পণে।

CamScanner

২. সংগীতের প্রতি প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। তাঁর নিজের ভাষায়—'I think, I am one of the most musical people in the world.' জার্মান সংগীতজগতের দিকপাল ওয়েগনার ও বিথোভেন ছিল তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব। মঞ্চনাটকও ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। 'Die Meister Singer' অপেরাটি তিনি একশবার দেখেছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রতি ছিল হিটলারের প্রবল আকর্ষণ। প্রতিদিন রাতের খাবারের পর অন্তত দুটো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখতেন তিনি। তাঁর প্রিয় ছবি ছিল 'Lives of a Bengal Lancer'—যা তিনি পরপর তিনরাত দেখেছিলেন। হিটলার ছবি আঁকতেন—প্রচুর ছবি এঁকেছেন তিনি। স্থাপত্যকলায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তিনি ছিলেন জার্মানির প্রধান স্থপতি। তাঁর চূড়ান্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে তৎকালীন জার্মানির কোনও সরকারি দালান নির্মিত হয়নি। হিটলারের নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি 'এস', অর্থাৎ—'Simplicity, Symmetry & Spaciousness.'

৩. হিটলার প্রচণ্ডভাবে আবেগতাড়িত ছিলেন। ক্ষমতায় থাকাকালে আবেগের তাড়নায় তিনি অনেক গর্হিত কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর আবেগের মধ্যে কখনও কখনও যে মানবিকতার স্পর্শ ছিল, ছিল রোমান্টিকতার মিশেলও—সাধারণ্যে তা প্রকাশ পায়নি কখনওই। ১৯৩৬ সালের কথা। হিটলার আপার ব্যাভিরিয়ার গ্রামের পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের উদ্দেশ্যে গাড়ি থামিয়ে পায়চারি করছিলেন তিনি। এসময় একজন তরুণী এগিয়ে আসতে চাইলে নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেয়। তরুণীটি কেঁদে ফেলেন। ঘটনাটির প্রতি হিটলারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি তাঁকে কাছে আসার অনুমতি দেন। তরুণীটি জানান তাঁর প্রেমিক তরুণটি কর্মহীন থাকায় তাঁরা বিয়ে করতে পারছেন না। তাই তিনি হিটলারের কাছে প্রেমিকের জন্য একটি চাকরি চান। আবেগাপ্লুত হিটলার তরুণটির জন্য শুধু চাকরির ব্যবস্থাই করেননি, তাঁদের দুজনের বিয়ে দিয়ে নববিবাহিত দম্পতির জন্য মিউনিখ শহরে একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত এপার্টমেন্টও উপহার দিয়েছিলেন। মজার বিষয় হল, ওই আসবাবপত্রের মধ্যে একটি 'বেবিকট'ও ছিল।

৪. নিষ্ঠুর যুদ্ধবাজ হিটলারের অন্য এক পরিচয়ে যে মহৎ মানবিকতার চিত্র ফুটে ওঠে তা আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। পোল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী ড. রউইকজ আবিষ্কৃত উদ্‌যান বোমার ফরমুলাটি গচ্ছিত ছিল তাঁরই কন্যা রেজিনা রউইকজের কাছে। ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর রেজিনা জার্মান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন এবং প্রচণ্ড নিপীড়নের মাধ্যমে তার কাছ থেকে বোমা নির্মাণের ফরমুলাটি হস্তগত করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে জার্মান বিজ্ঞানীরা উদ্‌যান বোমা নির্মাণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেন। কিন্তু ওই বোমার মারাত্মক বিনাশী শক্তির কথা ভেবে আতঙ্কিত হিটলার শেষ মুহূর্তে ওই বোমা নির্মাণের

CamScanner

পরিকল্পনা বন্ধ করে দেন। অথচ ওই আণবিক বোমা ব্যবহার করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই হল সাধারণভাবে পরিচিত যুদ্ধবাজ নিষ্ঠুর হিটলারের অপরিচিত অন্যরূপ। এই অন্য হিটলারের ভিন্ন জীবন-ক্যানভাসে আমরা দেখি তাঁর পালিত এক অ্যালসেশিয়ান কুকুরের বিষক্রিয়ায় মৃত্যুতে বেদনাহত তিনি শোক পালন করেন কয়েকদিন ধরে; যুদ্ধকালীন ব্যস্ততম মুহূর্তেও তাঁর সঙ্গী প্রিয় গোয়েবল্‌সের ছয় বছরের শিশুকন্যার সঙ্গে শিশুসুলভ সারল্যে খেলায় মেতে থেকে অবলীলায় ভুলে যেতে পারেন যুদ্ধের সমস্ত হিংস্র-নির্মমতা।

গ

জীবনানন্দ দাশ—নির্জনতার কবি, নিঃসঙ্গতার এবং ধূসর-বিষণ্ণতার কবি; যাঁর সমস্ত কবি-জীবন জুড়ে এক রহস্যময়তার কুয়াশাচাদর। কবি হিসেবে, তিনি কী ব্যক্তিজীবনে—কী কবিতায় নিজেকে আর সকলের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতেন এক দুরতিক্রম্য দূরতায়। এক নির্জনতার শীতল রহস্যময়তা তাঁকে ঘিরে থাকত সারাক্ষণ। নিজের সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই উদাসীন—সমাজ সম্পর্কে ছিল তাঁর আশ্চর্য এক ভীতিময় সংস্কার। কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তীব্রভাবে সজাগ। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নানা রূপে নানা প্রতীকে অন্ধকার তার গাঢ় ছায়া ফেলেছে অজস্রবার। কবিতার মতই কবি জীবনানন্দ দাশের সমস্ত জীবন জুড়েই ছিল এক ধরনের নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা। জীবনানন্দ দাশের এই রূপ—এই চরিত্রের সঙ্গে আমরা প্রায় সবাই মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু এর বাইরেও জীবনানন্দের আরেক রূপ আছে যা সাধারণভাবে অপরিচিত। বলা চলে, অন্য এক জীবনানন্দ।

স্বভাবে গুরুগম্ভীর, বিষণ্ণ প্রকৃতির জীবনানন্দ দাশ কখনও কখনও অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয় হয়ে উঠতেন। হাস্য-পরিহাসে, কৌতুকে-গল্পে যেমন হাসাতে পারতেন সবাইকে, তেমনই নিজেও হেসে উঠতেন চারদিক উচ্চকিত করে এক প্রকম্পিত হাসি। কবির বোন সুচরিতা দেবীর ভাষায়—'এত মজার মজার কথা বলতে পারতেন, হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে হোত। যে মানুষ এত গুরুগাম্ভীর্যের কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন বা অন্যকেও হাসিয়ে হাসিয়ে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন, তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

কলকাতার পার্কে-মাঠে যেখানেই হিউমারের গন্ধ পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক সবকিছুই তাঁর রসিকতা জ্ঞানকে সুড়সুড়ি দিত। অকুস্থল থেকে দূরে গিয়ে হাওয়ার মত হাসির ঝড় বইয়ে দিতেন। জীবনানন্দের এই হাওয়া কাঁপানো হাসি দেখেছেন অনেকেই। একবার ইন্দ্র মিত্র গেলেন কলকাতায় জীবনানন্দের বাড়িতে। দেখলেন, জীবনানন্দ শুয়ে আছেন—জ্বর হয়েছে। ইন্দ্র

মিত্রের প্রশ্নের জবাবে জীবনানন্দ তাক থেকে ওষুধ-ভরতি শিশি এনে বললেন—'ডাক্তার আমাকে এই ঔষধ খেতে দিয়েছে।' তিনি শিশি-র ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকে বললেন—'দারুচিনির গন্ধ'। তারপর এলো পথ্যের প্রসঙ্গ। জীবনানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ রাত্রে কী খাব?' ইন্দ্র মিত্র বললেন, 'রুটি খান'। 'ঠিক!' জীবনানন্দ ডান হাতের তর্জনী তুলে উঁচু করে বললেন, 'ঠিক! ডাক্তারও আমাকে রুটি খেতে বলেছেন।' তারপর হেসে উঠলেন। একেবারে নিজস্ব হাসি। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠতেন প্রচণ্ড শব্দে। আবার অকস্মাৎই হাসি থামাতেন। বাঁধভাঙা হাসি যখন বেরিয়ে আসত, মনে হত কী বিশাল আনন্দ ওই হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর এই অস্বাভাবিক অদ্ভুত প্রকৃতির হাসির প্রসঙ্গে আর-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। 'কলেজে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র-কবি হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন?' জীবনানন্দ দাশ এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে আছ বুঝি?' সে বললে, 'হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা এই সমাজব্যবস্থাকে বদলাতে চাই। কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। সেখানে কবি-সাহিত্যেকরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন। তাদের বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি পরিত্যাগ করে মার্ক্সবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে...'। কথার মাঝখানেই জীবনানন্দ দাশ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—'তুমি কার্ল মার্ক্স পড়েছ—ডস ক্যাপিটাল?' ছাত্র-কবিটি থতমত খেয়ে বললে—'না'। জীবনানন্দ একটুকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন আচম্বিতে বেরিয়ে আসা যে, অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না।'

এ তাঁর নিজস্ব হাসি—আকস্মিক এবং উচ্চকণ্ঠ। এ হাসি যেমন হঠাৎ শুরু হয়, বন্ধ হয় তার চেয়েও বেশি আকস্মিকভাবে।

এই জীবনানন্দ আমাদের বহু পরিচিত ধূসর বিষণ্ণতার কবি, হৈমন্তী রিক্ততার কবি জীবনানন্দ দাশ নয়। এ ভিন্ন কেউ—এক অপরিচিত মানুষ, অন্য এক জীবনানন্দ।

ব্যক্তি-চরিত্রের এই দ্বৈতসত্তা এবং তার বৈপরীত্যের এই রূপ আমাদের কেবলই বিস্ময়াভিভূত করে; জানা ও অজানার দিগন্তে যে দুস্তর ব্যবধান তাই যেন আমাদের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে এক বিপন্ন বিস্ময়।

সিলেট, ১৯৯৮

সৃজনশীলতা : দ্রোহ ও বেদনার উষ্ণীষ

বলা হয়, ইতিহাসের প্রথম কবি হলেন সুমেরীয় রাজা প্রথম সাইগনের কন্যা এনহেদুয়ান্না। অবশ্য তারও আগে রচিত হয়েছে কবিতা, কাব্যগুণসম্পন্ন গ্রন্থ। কিন্তু এর কোনওটিরই সুনির্দিষ্ট কোনও রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। সেই হিশেবে ২৩০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে রচিত এনহেদুয়ান্নার কবিতাই ইতিহাসের প্রথম কবিতা। এই কবিতায় তিনি লেখেন—

'আমরা গান গাই, শোকার্ত হই
এবং ক্রন্দন করি তোমারই সম্মুখে
এবং গভীর লজ্জার এক অন্ধকার থেকে
হেঁটে যাই তোমারই দিকে।'

আর ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে আমাদের আদি কবি হলেন ঋষি বাল্মীকি। ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের প্রতি ব্যাধের শরনিক্ষেপে ব্যথিত ঋষির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল—'মা নিষাদঃ ক্রৌঞ্চ-মিথুন ....'। বেদনাহত ঋষি-হৃদয়ের এই প্রথম উচ্চারণই আমাদের প্রথম কবিতা।

এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি, এক গভীর ক্রন্দন বা বেদনার ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়েছে আমাদের আদি কবিতা। এ-প্রসঙ্গে আমরা ইংরেজ কবি ই এম ফস্টারের একটি উক্তি স্মরণ করতে পারি—'মানুষ যে কী করে কবিতাকে আবিষ্কার করে বলা মুশকিল। সূর্যের বর্ণবিভা একজনকে কবি করে, প্রেমের ব্যঞ্জনাও একজনকে কবি করে। আবার মানুষের দুঃখকে অনুভব করেও একজন কবি হয়। তবে যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক একটি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে না-গিয়ে কারও পক্ষে যথার্থ কবি হওয়া সম্ভবপর হয় না।' শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নয়—যে কোনও সৃজনের সঙ্গে বেদনার রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। যে কোনও সৃষ্টিই উঠে আসে বেদনার সরোবরকে ছুঁয়ে। প্রত্যেক সৃজনশীল মানুষেরই হৃদয়ের গভীরে থাকে এক তীব্র যন্ত্রণা বা বেদনার আর্তি। এই বেদনা সৃষ্টির বেদনা। সৃষ্টিকর্মই শুধু নয়—আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের সঙ্গে, প্রতিটি ধ্বনির সঙ্গেও অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে বেদনার আবহ। আসলে, আমরা বাস করি নৈঃশব্দ্যের একটি চিরকালীন প্ল্যাটফরমে। সেখানে নৈঃশব্দ্যের স্থায়ী আস্তরণের ওপর শব্দগুলো ফুটে থাকে। এই নৈঃশব্দ্য হল অনাহত ধ্বনি—যাকে আমরা

CamScanner

শব্দব্রহ্ম বলি। এই অনাহত ধ্বনিকে আহত করার মধ্য দিয়েই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ধ্বনি—শব্দপুঞ্জ। আমরা যখন কথা বলি, উচ্চারণ করি শব্দ—তখন বাগ্‌যন্ত্রের নানা প্রত্যঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে আহত হয়েই বেরিয়ে আসে ধ্বনিপুঞ্জ। আমরা যখন সেতারের তারে টংকার দিই তখনই তা ধ্বনিত হয়ে ওঠে—তবলার গায়ে টোকা পড়লেই তা কথা বলে ওঠে—বাঁশিতে ফুঁ দিলেই তা বেজে ওঠে। আসলে, যে কোনও ধ্বনিরই সৃষ্টি হয় আহত করার মধ্য দিয়ে। আমরা যে কথা বলি—উচ্চারণ করি শব্দপুঞ্জ তার এসবই আহত ধ্বনি।

সৃজনশীলতা একটি মহৎ গুণ। একজন সৃজনশীল মানুষ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেন নানা শিল্পকর্ম—জীবনের গূঢ় চেতনার, মানুষের আনন্দ-বেদনার, আবেগানুভূতির শিল্পিত প্রকাশ। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তথা শিল্পী অন্তরে লালন করেন এক অসাধারণ চেতনা। যখন সৃষ্টিকর্মে বিভোর থাকেন তখন তিনি আর সাধারণ থাকেন না—সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে একধরনের স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের নৈতিকতাবোধ থাকে খুব প্রখর; অন্তত সৃষ্টির সময় তিনি নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন—শিল্পের প্রতি অনুগত থাকেন—পৃথিবীর তাবৎ কলুষ-কালিমা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে নিজস্ব সত্য আর ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকেন। একজন শিল্পী সার্বভৌম। আর তাই, শিল্পী মানেই এক ধরনের বিদ্রোহী; তার বিদ্রোহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে—পৃথিবীর সকল কলুষ-কালিমার বিরুদ্ধে—সকল অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—

'আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।'

আর শিল্পী পিকাসো, একবার যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকার একদল আধুনিক চিত্রশিল্পী তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন আমেরিকার সরকারি কর্মকর্তাদের বলেন যাতে তারা আধুনিক চিত্রশিল্প সম্পর্কে মনোযোগী হন, তখন পিকাসো সেই প্রিপেইড টেলিগ্রামের কোনও উত্তর না-দিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন—'শিল্পী মানেই বিদ্রোহী। কারণ সৃষ্টি হল বিদ্রোহের প্রতীক। সরকারি অনুগ্রহে তার পুষ্টি অসম্ভব।'

একজন শিল্পী, আপাত সত্য নয়, তিনি খুঁজে বেড়ান জীবনের প্রকৃত সত্যকে। নৈতিকতা তাঁকে তাড়িত করে এবং সংস্কৃতি তাঁকে শক্তি দেয়। যদি কোনও সংস্কৃতি ভেতর থেকে শক্তি না জোগায়—প্রগতির গতিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য না করে, তাহলে সে সংস্কৃতি সুস্থ সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি একটি বহমান ধারা। এক সংস্কৃতি ছুঁয়ে যায় অন্য সংস্কৃতিকে—এক ধারা এসে যুক্ত হয় অন্য ধারায়। এভাবেই গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ। সংস্কৃতির এই বহমান ধারায় যখন নানা স্রোত ও ধারা এসে যুক্ত হয় তখন এর কোন্‌গুলো

সুস্থ ধারা আর কোন্‌গুলো অসুস্থ তা নির্ধারণ করা কঠিন। কোনও মাপকাঠি দিয়ে—কোনও নির্ধারিত নীতি-নিয়মের দ্বারা তা নির্ণীত হয় না। বরং সংস্কৃতি নিজেই তা নির্ধারণ করে। মূল সংস্কৃতি যদি শক্তিশালী হয়—তার অন্তর্গত প্রাণশক্তি যদি প্রবল থাকে তাহলে সংস্কৃতি তার নিজস্ব নিয়মেই আত্তীকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয় সুস্থ ধারাগুলোকে আর উপেক্ষিত হয়ে ঝরে পড়ে যায় অসুস্থ ধারা। শুধু জোরে চিৎকার করলেই—প্রচার ও প্রকাশের ভঙ্গিতে চমক আর চটক থাকলেই যে কোনও কিছু গৃহীত হয়ে যাবে, সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রধান সুর হয়ে উঠবে এমন ভাবার কোনও অবকাশ নেই। আমরা দেখি, বহুল বিজ্ঞাপিত আকাশ-সংস্কৃতির এই যুগেও পাশ্চাত্যের এবং বহিরাগত অনেক কিছুই চমকে-গমকে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে মুখর করে তুলতে পারলেও এখনও আমাদের সংস্কৃতির মূলধারার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে, মুখর-ঝংকারের বিপরীতে মৌন-মুখরতাই আমাদের অধিক প্রিয়। তাই বর্তমান কালের এই বিজ্ঞাপিত শব্দ-ঝংকারের কলুষিত কোলাহলের মধ্যেও নীরব নিভৃত রবীন্দ্রসংগীত আর লোকজ ধারার সংস্কৃতিপ্রবাহই ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তার কারণ, রবীন্দ্রসংগীত যত না কানে শোনার—তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণে শোনার। এই গান আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে বলেই—এ গানের শব্দ বা সুর আমাদের মৌলতন্ত্রীতে অনেক অনুরণন জাগায় বলেই এই গান আমাদের এত বেশি প্রিয়। আর লোকজ ধারার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবার মূল কারণ—এর সঙ্গে রয়েছে শিকড়ের স্পর্শ, মাটির গন্ধ। আসলে, মৌল স্বভাবে মানুষ শিকড়সন্ধানী।

স্যামন মাছের জন্ম নদীর মিঠাপানিতে। কৈশোর কাটে তার সাগরের নোনাজলে। কিন্তু যৌবনে ডিম পাড়ার সময় এলেই তারা আবার হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে ঠিক তার জন্মস্থান নদীর মিঠাপানিতেই ফিরে আসে। মানুষও তেমনই—পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বা উৎকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার আবর্তে পড়ে যতই উন্মূল চেতনা তাকে তাড়িত করুক শেষাবধি মানুষকে ফিরে আসতেই হয় তার উৎসের কাছে—শিকড়ের কাছে। এভাবেই মানুষ শূন্যচারিতা ছেড়ে—উন্মার্গগামিতা ভুলে বারেবারেই ফিরে ফিরে আসে মাটির টানে। মাটি ও মানুষের এই নিবিড় বন্ধন চিরকালীন এবং অবিচ্ছেদ্য। এবং যিনি আপন বোধের আলোকে—মেধা ও মননের শক্তিতে মাটি ও মানুষের এই সম্পর্ককে বাস্তবে রূপায়িত করেন তিনিই শিল্পী, একজন সৃজনশীল মানুষ। শিল্পের প্রয়োজনেই তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হয় অন্তর্গত নিজস্ব চেতনার কাছে এবং শিল্পীর দায় এখানেই। শিল্পীকে তাঁর বিবেকের তাড়নাতেই এই দায় শোধ করে যেতে হয় তাঁর সৃজনকর্মের মাধ্যমে। শিল্পী, সৃজনশীলতা ও তাঁর শিল্পকর্ম—এই ত্রিভুজ শক্তির প্রভাবেই আমাদের সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হয় গতির ডানা, এগিয়ে চলে সভ্যতা।

সিলেট, ২০১২

CamScanner

কবিতা : এক অধরা প্রেমিকা আমার

কবিতা নিয়ে কিছু একটা লিখবো এরকম একটি গোপন ইচ্ছে হৃদয়ে লালন করেছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কী লিখবো—কীভাবে লিখবো; অথবা লেখাটা জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণে, গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগে, যুক্তি ও তথ্যের সমাহারে কতটা ভাবগম্ভীর হবে—নাকি এক রহস্যময়ী প্রেমিকার প্রতি আবেগের তীব্র উৎসারণে, হালকা ও চটুল শব্দপ্রয়োগে এক অন্ধ প্রেমিকের নিমগ্ন আত্মনিবেদনের দলিল হবে; ঠিক করে উঠতে পারিনি। এরকম ভাবতে ভাবতেই কেটে গেছে দীর্ঘ কাল। অথচ কবিতার সঙ্গে আমার প্রায় পাঁচ দশকের প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্কের পরও সে এক রহস্যময়ী রমণীর মতই অধরা থেকে গেছে আমার কাছে।

'আমি কবিতার এক মাতাল প্রেমিক।
আশৈশব আমি নিমগ্ন থেকেছি
কবিতার শরীর-শিল্পকে নিয়ে এক মুগ্ধতার পাঠে।
পারিপার্শ্বিক জীবন ও প্রকৃতির প্রতিটি লাবণ্যশোভায়
আমি কবিতার অনাবৃত শরীরী সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছি
আদিগন্ত সবুজ শস্যের মাঠ দেখে আমি কবিতাকে চিনেছি
যৌবনবতী রমণীকে দেখে কবিতাকে ভালোবেসেছি
শব্দের সঙ্গমে আমি কবিতাকে জন্ম দিয়েছি।
কবিতার সমস্ত শরীর জুড়ে আমি
উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্পের নানা শিল্পকর্ম দেখেছি
কবিতার নগ্ন নাভিমূলে দেখেছি আমি দ্রোহী চেতনার বীজ
আর কবিতার ব্যগ্র চোখে-মুখে প্রেমিকের প্রতি গোপন আমন্ত্রণ।
আমি পতঙ্গের মত ছুটে যাই প্রজ্বলিত কবিতা-শিল্পের দিকে
কবিতাও ধরা দেয় আমার লোমশ বাহুমূলে প্রগল্‌ভা নায়িকার মত।
আমি কবিতাকে নিয়ত নির্মাণ করি
ভাঙি-গড়ি, যখন খুশি হাসাই-কাঁদাই
তার চোখ-মুখ-স্তন-জঙ্ঘা-নিতম্ব
এক-এক করে ব্যবচ্ছেদ করি আমি শিল্পের ল্যাবরেটরিতে।

CamScanner

আমি কবিতাকে ব্যবহার করি ইচ্ছেমতো
প্রেমে ও দ্রোহে, আহারে-মৈথুনে—জীবনের প্রতি স্বরগ্রামে।
কবিতা আমার আটপৌরে পোশাক—প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ন্যাপকিন।
কবিতা আমার অনেক অকথিত কাহিনির গোপন সাক্ষী
আমার অনেক নিষিদ্ধ-যাত্রার একান্ত সঙ্গী এই কবিতা।
অথচ, এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে হয়েও
কবিতা চিরলাস্যময়ী—চিরযৌবনা
আমার মত অসংখ্য প্রেমিক-হৃদয়কে
বিষাদের সরোবরে ডুবিয়ে দিয়ে
সে নিজে নিঃসংকোচে বসে যায় অমরাবতীর অমর সভায়।
কবিতার মৃত্যু নেই;
কবিতা বেঁচে থাকে অমিতায়ু কালের করতলে।'[১]

কবিতা এমনই। আমার বাহুডোরে বার বার ধরা দিয়েও সে সবসময় অধরাই থেকে যায়। আমার আটপৌরে জীবনের সঙ্গী হয়েও—আমার অনেক প্রকাশ্য ও গোপন ঘটনার একান্ত সাক্ষী হয়েও সে থেকে যায় চিরলাস্যময়ী, চিররহস্যময়ী। তার স্থান থাকে অমরাবতীর অমর সভায়। অথচ আমার মত অসংখ্য প্রেমিক কবি বিষাদের সরোবরে ডুবে ডুবে একসময় হারিয়ে যায় কালের ঘূর্ণিস্রোতে।

প্রতিটি মানুষের আবেগ-অনুভূতি বা চৈতন্যের প্রথম উদ্‌বোধন কবিতা। অন্তত যৌবনের জাগরণ হয় কবিতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু কবিতাকে চেনা অনেক কঠিন। বহু যুগের—বহু জীবনের একান্ত সাধনার পরও কবিতা অচেনাই থেকে যায়। কবিতাকে সবসময় বিশেষ কোনও অবয়বে ধরা যায় না—শব্দের শৃঙ্খলে বন্দি করে তাকে যথার্থ সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবু অনেক প্রেমিক কবি কবিতাকে শৃঙ্খলিত করতে চেয়েছেন নিটোল শব্দের এক সাজানো ফ্রেমে। মহাকবি কালিদাসের ভাষায়—'কবিতা হচ্ছে শব্দ ও অর্থের নিত্য সংবদ্ধতায় শব্দ ও অর্থের প্রতিপত্তি।'[২] আর কবি অক্টাভিও পাজ বলেন—'কবিতা হল অন্যস্বর। ইতিহাস বা প্রতিইতিহাসের স্বর নয়—কিন্তু সেই অন্যস্বর যা সবসময় ইতিহাসে থেকেও অন্য কিছু বলছে।'[৩] ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়—'কবিতা হল শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্লাবন যার সৃষ্টি হচ্ছে এক প্রশান্ত আবেগের অনুস্মরণ থেকে।'[৪] আবার অন্য মতে—'কবিতা কবির গোপন আর নিজস্ব অনুভবের উন্মোচন পাঠক যা নিজের বলে শনাক্ত করেন।'[৫] আর আমাদের কবি ফজল শাহাবুদ্দীন বলেন—'চিরকালের প্রার্থনার মত উচ্চারিত যে শব্দাবলি যে স্তব তারই নাম কবিতা।'[৬] তবে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথাটি বলেছেন সেন্ট অগাস্টিন। তাঁর ভাষায়—'If not asked I know, if you asked me I know not.'[৭]

আসলেই তাই, কবিতা কী—তা আমরা প্রায় সবাই জানি। কিন্তু যদি শব্দের চৌহদ্দিতে বন্দি করে কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রশ্ন ওঠে—তখনই আমাদের সমস্ত শব্দ, সকল ভাষা, সব ধ্বনি এক অক্ষম শূন্যতায় নির্বাক হয়ে যায়। আসলে, মানুষের জীবন প্রকাণ্ড এক হিমশৈলের মত—যার মাত্র এক-দশমাংশ থাকে দৃষ্টির সীমানায়, আর বাকি নয়-দশমাংশই লুকোনো থাকে দৃষ্টির অন্তরালে। শব্দ ও ধ্বনির এক বিপুল বৈভবে বাঙ্ময় এই জীবনপ্রবাহে শব্দের অতীত—ধ্বনির অতীত এক বিশাল মৌনতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে আমাদের সমস্ত অন্তর্জগৎ জুড়ে। প্রকৃত কবিতা শব্দে প্রকাশিত হয় না; মৌনতায়—শব্দের অতীত কোনও এক অনির্বচনীয়তায় তা প্রকাশিত হয় যথাযথ। অথচ, আমাদের কবিদের অবলম্বন কেবলই ভাষা, শব্দ। এই শব্দ দিয়েই—এই ভাষা দিয়েই আমরা ধরতে চাই সেই অধরাকে, বাঙ্ময় করতে চাই সেই অবাঙ্মনসগোচরকে। শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দিয়েই আমরা প্রকাশিত করতে চাই মৌনতাকে। আর তাই আমরা একটি শব্দের টংকারে বাজাতে চাই অনেক অনুরণন—যা সেই শব্দের ধ্বনিকেও ছাপিয়ে আরও অনেক-অনেক মৌন ধ্বনিকে মুখর করে তুলবে।

অনেকে কবিতাকে তুলনা করেন স্থাপত্যের সঙ্গে। জোসেফ এডিসনের মতে স্থাপত্যের সঙ্গে কবিতার একটি অন্তর্গত মিল আছে। মিলটি হচ্ছে, 'স্থাপত্যের মত কবিতাকেও যদি মহৎ হতে হয়, তাহলে তার প্রতিটি অংশ এবং অঙ্গো-প্রত্যঙ্গো আমরা লক্ষ করবো সেই মহত্ত্ব। বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করে বলা যায়—স্থাপত্যের একটি নিদর্শন, ধরা যাক একটি ভবন, দূর থেকে দাঁড়িয়ে তার রূপকল্পনা, তার সৌন্দর্য, তার ছন্দ, এসব আমরা অনুভব করলাম, প্রশংসা করলাম; কিন্তু সে প্রশংসা হবে তাৎক্ষণিক এবং যুক্তিহীন; ভবনটির ভেতরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি দেয়াল, খিলান, দরোজা, ভূমি ব্যবহার, উপাদান ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মধ্যে যদি সেই ছন্দ, সৌন্দর্য এবং কল্পনা আমরা আবিষ্কার করতে না পারি তাহলে তাকে আর মহৎ সৃষ্টি বলা যাবে না। কবিতাও ঠিক তেমনই; কবিতা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে অভিভূত হওয়া কিছু নয়। প্রবেশ করতে হবে কবিতাটির অভ্যন্তরে, লক্ষ করতে হবে তার নির্মাণ-কল্পনা, শব্দপ্রয়োগ, ধ্বনিব্যঞ্জনা তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে, তবেই বলা যাবে এটি মহৎ কবিতা কি-না।'[৮] আর তাই অনেকে কবিতা রচনা করেন নানা ফর্ম ও টেকনিকের বিচারে—গাণিতিক হিসাব ও জ্যামিতিক বিন্যাসে। এবং একজন সমালোচক কবিতার গুণবিচারের লক্ষে শল্যচিকিৎসকের দক্ষতায় তার প্রজ্ঞা ও মেধার আলোকে একে একে ব্যবচ্ছেদ করেন কবিতার অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা, প্রকার ও প্রকরণ; এক-এক করে কবিতার শরীর থেকে সমস্ত সজ্জা ও সৌন্দর্য, রূপসুষমা বিযুক্ত করে কবিতাকে করে তোলেন নগ্ন-নির্জন। তারপর মেলে ধরেন কবিতার নির্মাণশৈলীর এক-এক বিবরণ। এভাবে গণিতের জটিল হিসাব আর জ্যামিতির বিপুল বিন্যাসে যে কবিতা নির্মিত হয় তার

নির্মাণশৈলী নিয়ে শব্দের পর শব্দ রচিত হতে পারে—স্তূপীকৃত হতে পারে প্রশংসার উচ্চারণ; কিন্তু তার প্রাণ? প্রাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে হিসাবনিকাশের জটিল দ্বন্দ্বে। আর যে কবিতায় প্রাণ নেই—সে কবিতা আরেক হৃদয়কে স্পর্শ করবে কোন শক্তিতে? একজন শল্যচিকিৎসকের মতই সমালোচকের কাজও কবিতার শরীর নিয়ে—প্রাণ তাঁর উদ্দিষ্ট নয়; যদিও প্রাণের প্রয়োজনেই তাঁর শরীর-সাধনা। কিন্তু একজন পাঠক—একজন বিমুগ্ধ পাঠক প্রজাপতির মুগ্ধতায় অবলোকন করতে চান কবিতার অন্তর্লীন সৌন্দর্য—মধুপের মত আকণ্ঠ তৃষ্ণায় পান করতে চান কবিতার প্রাণরস।

এই যে কবিতা—রহস্যময়ী রমণীর মত কবিতা; কত তার বয়ঃক্রম? কখন শুরু হয়েছে তার পথচলা? বলা হয় ইতিহাসের প্রথম কবি একজন রমণী, সুমেরীয় রাজা প্রথম সাইগনের কন্যা এনহেদুয়ান্না। অবশ্য তারও আগে রচিত হয়েছে কবিতা—কাব্যগুণসম্পন্ন গ্রন্থ। কিন্তু এর কোনওটিরই সুনির্দিষ্ট কোনও রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। সে হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে রচিত এনহেদুয়ান্নার এই কবিতাই ইতিহাসের প্রথম কবিতা।

> 'আমরা গান গাই, শোকার্ত হই
> এবং ক্রন্দন করি তোমারই সম্মুখে
> এবং গভীর লজ্জার এক অন্ধকার থেকে
> হেঁটে যাই তোমারই দিকে।'[৯]

আর ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে আমাদের আদি কবি হলেন ঋষি বাল্মীকি। ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চ মিথুনের প্রতি ব্যাধের শর নিক্ষেপে ব্যথিত ঋষির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল—'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম।' বেদনাহত ঋষি-হৃদয়ের এই প্রথম উচ্চারণই আমাদের প্রথম কবিতা। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি এক গভীর ক্রন্দন বা বেদনার ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়েছে আমাদের আদি কবিতা। এ প্রসঙ্গে আমরা ইএম ফস্টারের একটি উক্তি স্মরণ করতে পারি—'মানুষ যে কী করে কবিতাকে আবিষ্কার করে বলা মুশকিল। সূর্যের বর্ণবিভাও একজনকে কবি করে, প্রেমের ব্যঞ্জনাও একজনকে কবি করে। আবার মানুষের দুঃখকে অনুভব করেও একজন কবি হয়। তবে যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক একটি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে না গিয়ে কারও পক্ষে যথার্থ কবি হওয়া সম্ভবপর হয় না।'[১০] শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নয়—সৃজনের সঙ্গে বেদনার রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। যে কোনও সৃষ্টিই উঠে আসে বেদনার সরোবর ছুঁয়ে। তবে সৃজনশীলতার সঙ্গে শুধু বেদনা নয়—এক ধরনের বিদ্রোহভাবও জড়িয়ে আছে। কারণ, একজন শিল্পী সার্বভৌম। যে কোনও সৃষ্টির সময় তিনি হয়ে ওঠেন একজন

CamScanner

স্রষ্টা। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের নৈতিকতাবোধ থাকে খুব প্রখর; অন্তত সৃষ্টির সময় তিনি নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন—শিল্পের প্রতি অনুগত থাকেন—পৃথিবীর তাবৎ কলুষ-কালিমা থেকে উর্ধ্বে উঠে নিজস্ব সত্য আর ন্যায়ের প্রতি থাকেন অবিচল। আর তাই শিল্পী মানেই এক ধরনের বিদ্রোহী; তার বিদ্রোহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে—পৃথিবীর সকল কলুষ-কালিমার বিরুদ্ধে—সকল অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—

'আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।'[১১]

আর শিল্পী পিকাসো, একবার যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকায় একদল আধুনিক চিত্রশিল্পী তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন আমেরিকার সরকারি কর্মকর্তাদের বলেন যাতে তারা আধুনিক চিত্রশিল্প সম্পর্কে মনোযোগী হন, তখন পিকাসো সেই প্রিপেইড টেলিগ্রামের কোনও উত্তর না-দিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন—'শিল্পী মানেই বিদ্রোহী। কারণ, সৃষ্টি হল বিদ্রোহের প্রতীক। সরকারি অনুগ্রহে তার পুষ্টি অসম্ভব।'[১২]

কবিতা রচনা একই সময়ে সহজতম এবং দুরূহতম কাজ। কবিতা রচনা সহজতম—কারণ, কবিতা আঙ্গিকে ছোটো। খুব স্বল্প সময় ব্যয় করেই কবিতা রচনা সম্ভব। আবার গদ্য, বিশেষত প্রবন্ধ/ নিবন্ধ রচনার মত বিশেষ প্রস্তুতির—তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন নেই কবিতা রচনার ক্ষেত্রে। কিন্তু চাইলেই-তো আর কবিতা রচনা করা যায় না। আইডিয়া আছে, শব্দসম্ভার মজুত, উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্পের ঘাটতিও নেই হয়ত-বা; তারপরও একজন কবিকে কখনও কখনও একটি কবিতার জন্য অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন—এমনকী বছরের পর বছর। ফরাসি চিত্রকর এডগার ছেগা একবার মনস্থির করলেন কবিতা লিখবেন, সনেট। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যখন তা হয়ে উঠল না তখন বিরক্ত হয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি মালার্মেকে বললেন—'দেখোতো, কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার। সারাদিন ধরে চেষ্টা করছি, অথচ কবিতা বেরুচ্ছে না। আমার যে আইডিয়ার অভাব আছে তা নয়। অনেক আইডিয়াই মাথায় ঘুরছে, কিন্তু তারপরও...।' মালার্মে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কবিতা কি আইডিয়া দিয়ে হয়? কবিতা হয় শব্দ দিয়ে।'[১৩] কিন্তু শুধু শব্দ দিয়েই-বা কি কবিতা হয়? রবীন্দ্রনাথের-তো আর শব্দের অভাব ছিল না। তারপরও একটি গানের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় পনেরো বছর। রবীন্দ্রনাথ একই দিনে বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে অন্তর্ভুক্ত 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে এসো গানে'—এ গানটি রচনা করতে তাঁর সময় লেগেছে ১৪ বছর ৭ মাস। গানটি যখন শুরু হয় তখন তা ছিল প্রেম

পর্যায়ের। কিন্তু প্রায় পনেরো বছর পর যখন শেষ হল তখন দেখা গেলো ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত গান রূপে এটি পূজা পর্যায়ের গানে পরিণত হয়েছে।[১৪] কবিতা রচনা শুধু দুরূহই নয়—এর জন্য, অনেকে বলেন, প্রয়োজন অলৌকিক কিছুর। কেউ তাকে প্রেরণা বলেন—কেউ বলেন জীবনদেবতা। কেউ-বা একে ঈশ্বরের বিশেষ উপহার বলেও শনাক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে নোবেলবিজয়ী সোভিয়েত কবি যোশেফ ব্রডস্কির একটি ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারি। যোশেফ ব্রডস্কির জন্ম লেনিনগ্রাডে ১৯৪০ সালে। ১৯৭২ সালে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় এবং রাশিয়া থেকে তাঁকে বহিস্কার করা হয়। তিনি বলেছেন—'কবিতাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' তাঁর মতে স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমন করে যে সব ওষুধ, কবিতা তার চেয়েও কার্যকর এবং সুলভ। তিনি পান্থশালায় ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি কবিতাগ্রন্থও রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন—'কবিতাকে অবহেলা করলে জাতির অকল্যাণ হবেই।' কিন্তু এই কবিতার জন্যই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন তিনি। ১৯৬৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হওয়ার পরে বিচার আদালতের মুখোমুখি হন যোশেফ ব্রডস্কি।

> 'বিচারক : আপনার পেশা কী?
> ব্রডস্কি : আমি একজন কবি।
> বিচারক : কে আপনাকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? কে আপনাকে নিজেকে কবি বলে ঘোষণা দেওয়ার অধিকার দিয়েছে?
> ব্রডস্কি : কেউ না। কে-ই বা আমাকে মানব জাতির একজন হিসেবে এ পৃথিবীতে আসার অধিকার দিয়েছে?
> বিচারক : আপনি এ-জন্য কি কোনও শিক্ষা লাভ করেছেন?
> ব্রডস্কি : কিসের জন্য?
> বিচারক : একজন কবি হওয়ার জন্য। এ বিষয়ে আপনি কোনও স্কুল বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেননি কেন?
> ব্রডস্কি : কারণ, কবিতা রচনা একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় বলে আমি কখনও মনে করিনি।
> বিচারক : তাহলে এটা কী?
> ব্রডস্কি : আমি মনে করি, এটি (একটু বিব্রত হয়ে) ঈশ্বরের একটি উপহার।

বিচারে তাঁর নির্বাসনদণ্ড হয়। নির্বাসনের মাত্র আট দিন আগে যোশেফ ব্রডস্কি 'মানবযূথের স্তব্ধতা' নামে একটি কবিতা লেখেন।

> 'ঘন হয়ে আসে দিন, বেলাভূমি যদি বিষাদেই

ভরপুর, তবে
চাঁদের কলঙ্ক কি উদ্ভাসিত
মানবযূথে?

পিতার নিথর মুখ বিছিয়েছে শ্মশানের স্তব্ধতা;
বলো নগরপথিক, আমাকে কি মিলিয়ে নেবে
তোমাদের সাযুজ্য-সঙ্ঘে?
—কেন আজ আমি সঙ্ঘচ্যুত, বলো'[১৫]

কিন্তু এতকিছুর পরও কবিতাকে ত্যাগ করেননি যোশেফ ব্রডস্কি—কবিতাও ছাড়েনি তাঁকে। নির্বাসনদণ্ডের পর ১৯৭২ সালে তাঁকে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি আশ্রয় নেন আমেরিকায়। শেষ পর্যন্ত কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ছাড়াও আমেরিকার রাজকবি হয়েছিলেন তিনি। কবিতা এক অন্তরঙ্গ প্রেয়সীর মত—একজন প্রগল্‌ভা রমণীর মত প্রাণদ ভালোবাসায় আগলে রেখেছে তাঁকে আজীবন। আসলে, একজন কবির বেঁচে থাকার জন্য কবিতার মতই প্রয়োজন একজন রমণীরও।

একজন রমণী বাঁচিয়ে রাখে কবিকে
আর ফিরে ফিরে আসে ঘুরে ঘুরে আসে
যেন নদী চিরকালের যেন সমুদ্র ক্রমাগত কল্লোলের
(ফজল শাহাবুদ্দীন, কবির রমণী)

কবি বা কবিতার সঙ্গে রমণীর এই যে অবিচ্ছেদ্য সংলগ্নতা তারই আরেকটি ঘটনা বিবৃত করতে চাই কবি শামসুর রাহমানের জবানিতে—'লেনিনগ্রাডে দেখেছিলাম পঁচাশি বছর বয়স্ক এক কবিকে। তাঁর বাহুলগ্না ছিলেন এক সুন্দরী তরুণী। ভেবেছিলাম তরুণী বৃদ্ধ কবির নাতনি। আমার ভুল ভাঙিয়ে দিলেন অন্য এক কবি। সেই সুন্দরী বৃদ্ধ কবির বান্ধবী। আমরা সবাই যাচ্ছিলাম কবিতা পাঠের জন্য। বৃদ্ধ কবি যখন কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন, তখন আমার মনে হল আঠারো বছরের এক যুবক কবিতা পড়ছেন সুরেলা গলায়। লক্ষ করলাম, তাঁর তরুণী বান্ধবীর চোখে ভালো লাগার কী অপরূপ দ্যুতি! কবিরা বোধ হয় এভাবেই জীবনের আগুনে হাত সেঁকে নেন শীতার্ত বার্ধক্যে।'[১৬]

এ-ই হল কবিতা। হাজার বছরেরও বেশি বয়ঃক্রম পেরিয়ে যাবার পরও কবিতা এখনও বুড়িয়ে যায়নি। কবিতা চিরলাস্যময়ী, চিরযৌবনা। কখনও কিশোরীর চপলতা শরীরে—কখনও-বা তারুণ্যের উচ্ছলতা; কখনও রাত্রির মত রহস্যময়ী সে—কখনও-বা হৃদয়ে তার রমণীর পরিপূর্ণ ভালোবাসা। কবিতা কখনও প্রেমের ফুল ফোটায়—কখনও জ্বালায় দ্রোহের আগুন; কখনও আনন্দ,

কখনও বিষাদ-যন্ত্রণা, কখনও-বা প্রশান্তির প্রগাঢ় আলো ছড়ায় কবিতা। আসলে, প্রেমে ও দ্রোহে, আহারে-মৈথুনে, জীবনের প্রতি স্বরগ্রামে—সর্বত্রই কবিতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। তারপরও আমি কখনও তাকে শব্দের শৃঙ্খলে বন্দি করতে পারিনি—পারিনি উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্পের মোহন মায়ায় বেঁধে রাখতে। কবিতা তাই এখনও আমার কাছে এক রহস্যময়ী রমণী—এক অধরা প্রেমিকা আমার। তবু এই রহস্যময়ী রমণীরই জন্য—এই অধরা প্রেমিকা কবিতারই জন্য নিরবধি আমার অতন্দ্র অন্বেষণ; তারই জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা—অনন্ত অপেক্ষা আমার।

সিলেট, ২০০৫

তথ্যসূত্র

১. এ কে শেরাম-এর 'কবিতা' শিরোনামযুক্ত কবিতা।
২. আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন; সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; ১৯৯৫; পৃ. ১১৩।
৩. সমরেশ দেবনাথ; অক্টাভিও পাজ : একটি ব্রহ্মাণ্ড জন্মগ্রহণ : একটি ব্রহ্মাণ্ডের পতন; বাংলাবাজার সাহিত্য সাময়িকী; ২৫.০৪.১৯৯৮।
৪. মঈন চৌধুরী; প্রসঙ্গ : কবিতা, কবি ও পাঠক; আজকের কাগজ; ২৭.০৬.১৯৯১।
৫. কোয়াসিমোদো; আজকের কাগজ; ০২.০৭.১৯৯১।
৬. আল মুজাহিদী; কবির ক্রন্দন ॥ কালের সিম্ফনী; জনকণ্ঠ; ০৪.০২.১৯৯৬।
৭. মরণ চক্রবর্তী; পাঠকের কবিতা সমস্যা; বাংলার বাণী সাময়িকী; ২৯.০৫.১৯৯২।
৮. সৈয়দ শামসুল হক; হৃৎ কলমের টানে; সংবাদ সাহিত্য সাময়িকী; ১৪.০৩.১৯৯১।
৯. মুনির রানা; কবিতা : নারীবাদী কবির, নোবেলজয়ী কবির; ভোরের কাগজ সাহিত্য সাময়িকী; ১১.০৪.১৯৯৭।
১০. আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন; সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; ১৯৯৫; পৃ.১১১।
১১. বুদ্ধদেব বসু; বন্দীর বন্দনা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মানুষ' কবিতা থেকে।
১২. অনিবুদ্ধ; আপনারে অপমান করো না কখনও; সংবাদ; ০৪.১১.১৯৮০।
১৩. জিয়াউল আহসান; কবি ও কবিতা; বাংলার বাণী; ১৮.০৮.১৯৯৫।
১৪. জিয়াউল আহসান; কবি ও কবিতা; বাংলার বাণী; ১৮.০৮.১৯৯৫।
১৫. দাউদ হায়দার; যোশেফ ব্রডস্কি—কবির নির্বাসন ও মৃত্যু; দৈনিক জনকণ্ঠ সাময়িকী; ১৬.০২.১৯৯৬।
১৬. শামসুর রাহমান; অন্যের মানসে বসবাস; ভোরের কাগজ; ০২.০৭.১৯৯২।

CamScanner

স্বপ্ন দেখি স্বপ্নপূরণের

মানুষ স্বপ্নবিলাসী। মানুষ স্বপ্ন দেখে নিরন্তর—আর জীবনের আলো ও বাতাসে লালন করে কিছু কিছু স্বপ্নকে অনুবাদ করে বাস্তবে। আবার অনেক স্বপ্ন পরিচর্যাহীন বাস্তবতায় শূন্যতার সমুদ্রে মিলিয়ে যায় বুদ্‌বুদের মত।

এসব বিষয় নিয়ে যখন একাকী ভাবছিলাম তখনই একটি চিঠি এলো সিলেটের একটি দৈনিক পত্রিকার অফিস থেকে। এই পয়েলা বৈশাখে তাঁদের প্রকাশনার তিন বছরপূর্তি হবে। আর এই তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যার জন্য আমিও যেন একটি লেখা দিই। এই 'তিন বছর' শব্দটিই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমাকে সচকিত করে তুললো। মনে পড়লো, এমনই তিনটি বছর আগে একদিন একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি—যা প্রতিনিয়ত ঝাপটে ফিরছে আমার স্মৃতির অলিন্দে অলিন্দে আর মাথা কুটে মরছে জীবন-বাস্তবতায় সবুজ স্বপ্নের ফুল হয়ে ফুটে ওঠার জন্য। সেই থেকে প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখে চলেছি সেই 'স্বপ্ন' পূরণের। আজ এই সুযোগে আমি বিবৃত করতে চাই আমার সেই স্বপ্ন-কাহিনি।

২০০১ সালের মার্চে এক মাসের এক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে ভারতের গুজরাটে গিয়েছিলাম। গুজরাট রাজ্যের রাজধানী আহমেদাবাদ প্রাচীন নগরি। এখন অবশ্য আহমেদাবাদ বেশি জনবহুল ও পুরোনো হয়ে গেছে বলে রাজ্যের রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গান্ধীনগরে—আহমেদাবাদ থেকে প্রায় দশ কিলোমিটারের দূরত্বে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা একটি নতুন শহরে। আহমেদাবাদ শহরকে ঘিরে রয়েছে নানা মিথ, কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিক কাহিনি। টেক্সটাইল শিল্পের জন্য খ্যাত এই প্রাচীন নগরি। ঐতিহাসিক সবরমতী নদীর তীরে আহমেদাবাদের অবস্থিতি। এই সবরমতী নদীর তীরে আছে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম—সবরমতী আশ্রম। এই আশ্রম থেকেই গান্ধীজি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম তাই সত্যাগ্রহ আশ্রম নামেও পরিচিত। গুজরাটে পৌঁছার প্রথম দিনই সবরমতীকে দেখে আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এক অন্যরকম বোধের। গুজরাটের সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে আমাদের 'রিসিভ' করতে আসা কর্মকর্তাদের সঙ্গে রওনা দিয়েছি ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 'এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব

CamScanner

ইন্ডিয়া (ইডিআইআই)'-এর উদ্দেশে। এটি আহমেদাবাদ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। আহমেদাবাদ শহর পেরিয়ে আমাদের গাড়ি যখন ইনস্টিটিউটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল তখন আমরা বেশ বড়ো একটি সেতু অতিক্রম করে যাই। জানলাম, সবরমতী নদীর ওপর দিয়ে এই সেতু। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের কিছুটা ম্লান আলোয় আমি অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, সবরমতী নদীতে কোথাও কোনও জলের আভাস নেই, শুধু শুকনো বালির হাহাকার নদীর বিশাল শূন্য বুক জুড়ে। নদীর উজানে নাকি বাঁধ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে পানি নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্যত্র চাষবাস বা অন্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু, নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ আমি। তাই জলশূন্য নদীর এই হাহাকার আমাকে কেমন তাড়িত করে। রাতে ঘুমুতে পারিনি; আসলে, সবরমতীর শূন্য বুক আর আকুল হাহাকার আমাকে ঘুমুতে দেয়নি। রাত জেগে একটি কবিতা লিখেছিলাম সেদিন সবরমতীকে নিয়ে। তারই প্রথম কয়েক পঙ্ক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি।

'একদিন তোমার যে বিশাল বুক জুড়ে বয়ে যেত জীবনের নহর,
সবরমতী, আজ সেখানে কেবলই বালির কারুকাজ
—এক অন্তহীন শূন্যতারই অপার্থিব হাহাকার।
তুমি কেবল মৃতবৎসা কোনও জননীর মত
অথবা এক বন্ধ্যা রমণীর অস্ফুট বেদনায়
অশ্রুহীন কান্নায় একাকী ভাসাও বুক বিজন অন্ধকারে।'

আন্তর্জাতিক সেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ থেকে ছিলাম আমরা পাঁচজন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীলঙ্কার পাঁচজন এবং টোঙ্গার একজন প্রশিক্ষণার্থী। মাত্র মাস কয়েক আগে গুজরাটে আঘাত হেনেছে শতাব্দীর ভয়াবহতম ভূমিকম্প—যার বিষাক্ত ছোবলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ভুজ, কচ্ছ, আনজির, সৌরাষ্ট্র। আহমেদাবাদ শহরেও আমরা সেই বিশাল ভূমিকম্পের সামান্য ফুৎকারে ধসে যাওয়া অনেক আকাশচুম্বী অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। যে ইনস্টিটিউটে আমাদের প্রশিক্ষণ সেই 'ইডিআইআই' ভবনটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি বিশ্বখ্যাত স্থাপত্যবিদ লুই কানের স্থাপত্য নকশার ওপর। অনুপম তার নির্মাণশৈলী—অপূর্ব তার স্থাপত্যকলা। বিশাল এলাকা জুড়ে নির্মিত লাল ইমারতের এই ইনস্টিটিউট ভবনের চারদিক ঘিরে আছে নিমের বাগান। যেন ছবির মত সাজানো একটি শিল্পকর্ম। কিন্তু দুঃখজনক হল, অনুপম স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এই ইনস্টিটিউট ভবনটিও রক্ষা পায়নি ভূমিকম্পের করাল ছায়া থেকে। স্থানে স্থানে বিশাল বিশাল চিড় ধরেছে ভবনের গায়ে। দেখে বড়ো কষ্ট হয়। প্রকৃতির বিরাটত্বের কাছে আমাদের অসহায়ত্ব প্রকটিত হয় প্রবলভাবে।

আমাদের প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরই অংশ হিসেবে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় পার্শ্ববর্তী রাজ্য রাজস্থানের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে। রাজস্থান মরুরাজ্য হলেও উদয়পুর তার বিরল ব্যতিক্রম। সবুজে-শ্যামলে ভরপুর উদয়পুর যেন প্রকৃতির এক সাজানো বাগান। মহাপ্রকৃতি তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে এই উদয়পুরকে সাজিয়ে রেখেছে এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে। প্রাচ্যের ভেনিস হিসেবে খ্যাত উদয়পুর সম্পর্কে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ লিখেছিলেন—'সমগ্র ভারতে উদয়পুরের ন্যায় ছবির মত সাজানো শহর আর নেই।' আর ইংরেজ কবি রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের ভাষায়—'উদয়পুর দেখা না হলে ভারত ভ্রমণই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' আরেকজন বিদেশি পর্যটক তো আরও একধাপ এগিয়ে বলেন—'ভেনিস দেখে আপনি মরে যেতে পারেন, কিন্তু উদয়পুর দেখার পর আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে বার বার ফিরে ফিরে উদয়পুরকে দেখার জন্যই।'

ইতিহাসের পাতা ওলটালে আমরা দেখি বারংবার মোগল আক্রমণে বিপর্যস্ত চিতোরের রাজা মহারাণা উদয় সিংহ যখন নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে ফিরছিলেন তখনই ১৫৫৯ সালে একদিন শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে পৌঁছে যান বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ পিছলা সাগরের কাছে। দেখলেন নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর বসে আছেন ধ্যানমগ্ন এক সাধু। রাজা উদয় সিংহ সাধুর পা স্পর্শ করে প্রণাম করতেই সাধু ধ্যাননিমীলিত চোখ মেলে দেখলেন সামনে বসে আছেন এক দিব্যকান্তি পুরুষ। সাধু যখন তার পরিচয় এবং মনোকষ্টের কারণ জানলেন তখন তিনি রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন—'তুমি এখানে তোমার রাজধানী নির্মাণ করতে পারো। তাহলে তা কখনওই তোমার শত্রুদের হাতে পরাভূত হবে না।' সাধুর পরামর্শ অনুযায়ী মহারানা উদয় সিংহ ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন করলেন রাজধানী নির্মাণ—যার নাম হল উদয়পুর। পরবর্তীকালে তিনি নিরুপদ্রবে রাজত্ব করেছেন বংশপরম্পরায়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে উদয়পুর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে।

উদয়পুরকে বলা হয় 'সিটি অব লেকস'—হ্রদের নগরি। পিছলা সাগর, ফতে সাগর, জয়সমন্দ, উদয় সাগর, রাজসমন্দ—এমনই অসংখ্য ছোটো-বড়ো প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ এবং জলাশয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নগরির সর্বত্র। তার পারে পারে গড়ে উঠেছে বিশাল সৌধমালা, রাজপ্রাসাদ আর অনুপম সব ভবন। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, প্রকৃতির অনুপম লীলানিকেতন উদয়পুরকে দেখার জন্য প্রতি বছর এখানে আসে লক্ষ লক্ষ পর্যটক। এমনই অসংখ্য পর্যটকের ভিড়ে মিশে গিয়ে আমরাও বেরোলাম নগর প্রদক্ষিণে। ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে পড়লাম 'শিল্পগ্রাম'-এ। লেক ফতে সাগরের পশ্চিমপারে এর অবস্থিতি। বেশ কয়েক একর জায়গা জুড়ে এই শিল্পগ্রাম। টিকিট নিয়ে ঢুকতে হয় ভেতরে। বিভিন্ন গ্রামীণ ও লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিশাল এবং স্থায়ী এক

প্রদর্শনী। গ্রামের আদলেই সাজানো হয়েছে পুরোটা এলাকা। কোথাও দাঁড়িয়ে আছে ভারতের কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনও জনগোষ্ঠীর ঘরের নমুনা। কোথাও তাঁতিরা কাজ করছে—শিল্পীরা নিমগ্ন হস্তশিল্পে; আবার কোথাও-বা চলছে বিশেষ কোনও অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রথমেই চোখে পড়ল পূর্ব গুজরাটের একদল শিল্পীর পরিবেশনা—অনেকটা সাঁওতালি নৃত্যের মতই। একটু এগোতেই দেখি কাশ্মীর অঞ্চলের শিল্পীদের গান—তারপর যোধপুর অঞ্চলের শিল্পীদের নাচ। এমনি ঘুরে ঘুরে দেখছি—কোথাও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পসরা সাজানো, কোথাও শিল্পীরা কাজ করছে দেশীয় তাঁতে বা ব্যাপৃত বুননকর্মে। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম গুজরাটি ঘরের সামনে। গুজরাটিদের একটি বাড়িতে একটিমাত্র পরিবার থাকে। তাদের ঘরের ভেতরে চতুর্দিকে লাগানো থাকে আয়না—উদ্দেশ্য, অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা; যেন অশুভ শক্তি আয়নায় নিজের ছায়া দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ওই একই উদ্দেশ্যে তারা ঘরের প্রবেশপথে বেঁধে রাখে লেবু, মরিচ ও কাঠকয়লা। অন্যদিকে রাজস্থানী পরিবার একান্নবর্তী হয়। রাজস্থানী বাড়িতে অনেক ছোটো ছোটো ঘর থাকে। রাজস্থানী মেয়েরা পর্দানশীল। তারা খাটে শোয় না এবং কখনওই স্বামীর আগে আহার করে না। আর রাজস্থানী পুরুষরা ঐতিহ্য অনুসারে তিনটি কাজ করতে পারে না—পানি আনা, কাপড় কাচা এবং রান্না। লোকসংস্কৃতির বিচিত্র সব সম্ভার দেখে দেখে এক মুগ্ধতার আবেশ নিয়ে বেড়িয়ে এলাম শিল্পগ্রাম থেকে। তারপর ছুটে যাওয়া অনতিদূরের ভারতীয় লোককলামণ্ডলে। কারণ, সেখানে শো শুরু হবে সন্ধ্যা ৬ টায়। এই ভারতীয় লোককলামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন পদ্মশ্রী দেবীলাল সামর ১৯৫২ সালে। সেই থেকেই চলছে লোকসংস্কৃতির নিয়মিত পরিবেশনা। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭ টা—এক ঘণ্টার প্রদর্শনী। এখানেও টিকিটের ব্যবস্থা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পীরা এসে এখানে প্রদর্শন করে থাকেন লোকসংস্কৃতির নানা উপচার। আমাদের দিনটি ছিল রাজস্থানী লোকসংস্কৃতির প্রদর্শনী। প্রথমে হল পুতুলনাচ। পরে গুরুবন্দনা—একটি মেয়ে সারা অঙ্গে, হাতে ও পায়ে ১৩টি করতাল বেঁধে রেখে নাচের অনুপম মুদ্রায় বাজাতে থাকল করতালগুলো। শারীরিক কসরত এবং নৃত্যশৈলীর এক অপূর্ব পরিবেশনা। এর পর এলো এক পুরুষ নৃত্যশিল্পী। মাথায় কলস নিয়ে নাচ। একে একে মাথার উপরে তুলে নিলো ১০ টি কলস—তারপর কখনও থালার উপরে দাঁড়িয়ে, কখনও-বা পিতলের গ্লাসের ওপর দাঁড়িয়ে পরিবেশন করল নানা ভঙ্গিমার নাচ—শারীরিক কসরত। সঙ্গে রাজস্থানী লোকসংগীত। সংগীতের ভাষ্য হল—স্বামী পানি আনতে যাচ্ছে দূর জলাশয়ে। স্ত্রী বলছে, তুমি সুপুরুষ—ওখানে যেও না—অন্যের চোখে পড়ে যাবে। স্বামী বলছে, ও কিছুই হবে না—এ নিয়ে তুমি মিছেমিছি ভেবো না। সবশেষে পরিবেশিত হল একটি মেয়ের একক নৃত্য। সব মিলিয়ে অপূর্ব। এক পিনপতন স্তব্ধতায় হলভরতি দর্শক উপভোগ করল রাজস্থানী লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ পরিবেশনা। ভারতীয়

লোককলামণ্ডলের আরেক আকর্ষণীয় দিক হল—এই ভবনের অন্য পাশে অবস্থিত মূল্যবান জাদুঘর, যেখানে সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদির সমৃদ্ধ সংগ্রহ।

গ্যালারিতে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছি সমস্ত কিছু আর ভাবনার দোদুল দোলায় দুলতে দুলতে ক্রমশ সরে যাচ্ছি একা—জনারণ্য থেকে দূরে। কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে মুহূর্তে পৌঁছে যাই আমার প্রিয় মাতৃভূমি—প্রিয় শহর সিলেটে। মনে পড়ে, সিলেটও তো নানা জন ও জাতি, নানা ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলনে সমৃদ্ধ এক অঞ্চল। প্রত্যন্ত জনজীবনের নানা জনগোষ্ঠীর লোকজ ধারার সাংস্কৃতিক ঋদ্ধতার ঐতিহ্য রয়েছে সিলেটের। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দেশি ও বিদেশি জনসমক্ষে যথাযথভাবে উপস্থাপনের তেমন কোনও সুযোগ আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি আজও। ফলে, এগুলো আধুনিক লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অবজ্ঞায় আর অবহেলায় ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। এমনিতে প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের কারণে সিলেট পর্যটকদের অনন্য আকর্ষণীয় অঞ্চল। এর সঙ্গে যদি সিলেটের আঞ্চলিক ও লোকজ সংস্কৃতির এই বর্ণবৈচিত্র্যকেও তুলে ধরার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে পর্যটকদের আকর্ষণ নিঃসন্দেহে আরও বেড়ে যাবে। আর সিলেটে বেসরকারিভাবে 'শিল্পগ্রাম' বা 'লোককলামণ্ডল'-এর মত লোকজ সংস্কৃতির নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা মোটেও দুরূহ কোনও কাজ নয়। কারণ, সিলেটে আছেন চিত্ত ও বিত্তের বৈভবে গরীয়ান অনেক মানুষ। প্রয়োজন শুধু এই দুয়ের সুষম সমন্বয়। আমি জানি, একদিন তা হবেই এবং বহুবর্ণা প্রজাপতির মতই পাখা মেলবে আমার আকাঙ্ক্ষার পাখিগুলো।

সেদিন থেকেই আমি হৃদয়ে লালন করে চলেছি একটি স্বপ্ন—আমার প্রিয় শহর সিলেটে একদিন নিশ্চিতই গড়ে উঠবে এমনি প্রতিষ্ঠান—যার মাধ্যমে সিলেটের সমৃদ্ধ লোকজ সংস্কৃতির বর্ণবৈচিত্র্যকে নিয়ত পরিচর্যায় আরও পরিশীলিত এবং উজ্জ্বল করে তোলা যাবে এবং দেশি ও বিদেশি লোকসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হবে আমাদের লোকসংস্কৃতির বিভান্বিত বর্ণবৈচিত্র্যকে।

আমি প্রতিনিয়ত তাই স্বপ্ন দেখি সেই 'স্বপ্ন' পূরণের।

সিলেট, ২০০৪

CamScanner

ভাষা নিয়ে ভাবনা

মানুষের লক্ষ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল ভাষা। ভাষাবিহীন মানুষের পৃথিবী যেন খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত অজস্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। প্রতিটি মানুষ সেখানে একে অপরের থেকে যোজন যোজন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা এক-এক প্রাণহীন ল্যাম্পপোস্টের মত। ভাষা, এক অনুপম সেতুবন্ধ হয়ে সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোকে গ্রথিত করেছে একসূত্রে—প্রাণের অবিম্লান আলোয় গ্রন্থিবিহীন গ্রন্থিতে বেঁধেছে এক হৃদয়ের সঙ্গে আরেক হৃদয়কে। এ ভাষারই গতিময়তায় অবগাহন করে প্রবাহিত হয়েছে সাহিত্যের সৃজন-স্বপ্নের ধারা—সংস্কৃতির অন্তঃসলিলা প্রবাহ। এভাবেই মানুষ নিজেকে ক্রমশ বিকশিত করেছে—শীলিত করেছে। ক্ষুদ্র মানুষ সময়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে বিশাল ও মহৎ হয়ে উঠেছে—মাটির বুকে দাঁড়িয়েই অনন্ত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যাশার হাত। মানুষের এই ক্রম-উত্থানের প্রধান বাহনই হল ভাষা। কিন্তু ভূগোল ও ইতিহাসের নানা জটিল জটাজালে আটকে পড়ে মানুষ একসময় বিভাজিত হয়েছে নানা 'গণ' ও 'গোষ্ঠী'-তে; খণ্ডিত হয়েছে মানুষের ভাষা। তারপর স্বকীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য সীমানা-প্রাচীরের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে মানুষ ক্রমশ একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই ভাষা—এই সংস্কৃতি—এই বর্ণ ও শ্রেণির বিভাজন মানুষকে আবারও এক-এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত করেছে; ঠেলে দিয়েছে একে অপরের থেকে যোজন-যোজন দূরত্বে। জন্ম হয়েছে জাতিরাষ্ট্রের—প্রচণ্ড জাত্যাভিমানপ্রসূত স্বাতন্ত্র্যচিন্তা মানুষকে আরেক মানুষ থেকে ক্রমশ দূরগামী করেছে—শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নবাদিতার দুর্গপ্রাচীর নির্মাণের প্রক্রিয়া। তারপর ইতিহাসের নিয়মেই কোনও কোনও 'গণ' ও 'গোষ্ঠী' উপেক্ষায়-বঞ্চনায় যেমন আত্মকোটরবাসী হয়েছে, তেমনই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বৃত্তাবদ্ধ থেকে গেছে কেবলই আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত সীমানায়। অন্যদিকে কোনও কোনও জনগোষ্ঠী যেমন শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্যের তুলনায় বৃহৎ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে—তেমনই অনেক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাবে-ঔজ্জ্বল্যে হয়ে ওঠে সর্বপ্লাবী ও সর্বগ্রাসী। শুরু হয় ক্ষমতার মদমত্ততায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় পুষ্ট রাষ্ট্রীয় এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। এমনই এক ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়েই ১৯৫২ সালে বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছিল 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র অনন্য ইতিহাস, যে ইতিহাসের অমোঘ

শক্তি বাঙালির পরবর্তী ইতিহাসের সকল চলমানতার মূল চালিকাশক্তি হয়েছে—জাতির ইতিহাস-শকটকে নানা ধাপ ও স্তর পেরিয়ে শেষাবধি পৌঁছে দিয়েছে প্রত্যাশার তুঙ্গশীর্ষ সীমানা, স্বাধীনতার উজ্জ্বল উপত্যকায়। শুধু তা-ই নয়, 'একুশে'র উজ্জ্বল মহিমা বাংলা এবং বাঙালিকে এক অনুপম ঔজ্জ্বল্যে অভিষিক্ত করেছে বিশ্ববলয়ে—বাঙালির প্রাণের 'একুশ' আজ 'ইউনেসকো'র স্বীকৃতির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। আর এর ফলে বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠী যেমন একুশের চেতনার আলোকে নিজ-নিজ মাতৃভাষাকে ভালোবাসার অধিকতর প্রেরণা পেয়েছে তেমনই রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাঁধেও অর্পিত হয়েছে এক অপরিসীম দায়িত্ব। উপেক্ষায়-বঞ্চনায় পার্শ্বপর্দার অন্ধকার অন্তরালে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা ও সংস্কৃতিগুলোকে হৃদয়ের অনিন্দ্য ভালোবাসা আর সহযোগিতার উজ্জ্বল আলোক প্রক্ষেপণে পাদপ্রদীপের দীপ্র আলোয় উদ্ভাসনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদতার কৃষ্ণবিবর থেকে তুলে আনার দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরই। কারণ, আমরা জানি, মানুষের তিনটি অহংকারের বিষয় হল—মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা। শুধু অহংকার নয়, মানুষের প্রধান ভালোবাসাও এ-তিনটি। আমরা অনেক কিছুই ভুলে যেতে পারি—বদলে ফেলতে পারি জীবনের অনেক বিষয়; কিন্তু মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা যেমন কখনওই বদলানো যায় না—তেমনই সম্ভব নয় ভুলে যাওয়াও। মানুষের প্রথম স্বজন হল তার মা। দ্বিতীয় স্বজন তার মাতৃভূমি, যে তাকে মায়ের মতই লালন করে—পালন করে মাতৃস্নেহে। আর সেই মায়ের মুখের ভাষাই হল তার মাতৃভাষা। মানুষের মা হলেন দুজন—জন্মদাত্রী জননী আর দেশমাতৃকা। তাই কখনও কখনও মানুষের মাতৃভাষাও থাকে দুটো—জন্মদাত্রী জননীর ভাষা আর দেশমাতৃকার ভাষা। তবে জন্মদাত্রী জননীর ভাষাই প্রতিটি মানুষের প্রথম মাতৃভাষা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর দেশমাতৃকার ভাষা হল তার দ্বিতীয় মাতৃভাষা। মা এবং মাতৃভূমির পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই মাতৃভাষা; যাকে বলা যায় মানুষের 'জন্মদাগ', যে দাগ কখনও মুছে ফেলা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন, মানুষ কোনও না-কোনও সময়ে পৃথিবীর কোথাও না-কোথাও জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে ওঠে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে—তারপর জীবনের প্রয়োজনে হয়ত-বা সে একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই জনগোষ্ঠী থেকে—কিন্তু কোনও কিছুই তার উৎস মুছে দিতে পারে না, তার জন্মদাগ সে বয়ে চলে সর্বত্র। ওই জন্মদাগ হল তার মাতৃভাষা। পর্তুগিজ কবি ফের্নান্দ পেসোয়ার কাছে-তো তাঁর স্বদেশ মানেই তাঁর মাতৃভাষা, পর্তুগিজ ভাষা। যেখানেই তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলা হয় সেখানেই তাঁর স্বদেশের অবস্থান। ফের্নান্দ পেসোয়ার কাছে এভাবে মাতৃভাষাই হয়ে ওঠে তাঁর স্বদেশের নামান্তর। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার তাই মানুষের প্রধানতম মৌলিক অধিকার। অথচ আমরা জানি, আমাদের প্রাণের এই পৃথিবীতে তার অনেক প্রিয় সন্তান নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার

থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এটা শুধু মৌলিক অধিকারের বরখেলাপই নয়—এক অর্থে অমানবিকও। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমরা লক্ষ করেছি, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যপ্রাপ্ত ভাষা-সাহিত্য বা জনগোষ্ঠী সবসময়ই পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে—আর অন্যগুলো ক্রমশ হারিয়ে গেছে পার্শ্বপর্দার অন্তরালে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের প্রধান জাতিসত্তা বাঙালি এবং প্রধানতম ভাষা বাংলা। কিন্তু বাঙালি ছাড়াও এদেশে যেমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস—তেমনই বাংলার পাশাপাশি এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষা হিসেবে অনেক ভাষারও অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে এখন ছয় সহস্রাধিক ভাষা জীবিত আছে। তবে এগুলোর মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক ভাষা আগামী ৫০ বছরের মধ্যে হয় পুরোপুরি মরে যাবে, না-হয় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। আবার কারও কারও মতে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ ভাষাই মরে যাবে। আমরা জানি, পৃথিবীতে ছোটো ছোটো অনেক ভাষা ইতোমধ্যেই হারিয়ে গেছে—এখনও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। গত তিন মাসে ভারতের আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দুটি ভাষা চিরতরে হারিয়ে গেছে। আরও অনেক ভাষা হারিয়ে যাওয়ার হুমকির মধ্যে বেঁচে আছে। শুধু ভারতেই প্রায় ২০০টি ভাষা বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার ভয়াবহ হুমকির মুখে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা 'ইউনেসকো'। এই ভাষাগুলোর প্রতিটি কোনও না-কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। আর তাই একটি ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানেই একটি জাতির হারিয়ে যাওয়া—হারিয়ে যাওয়া তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভাষা হারিয়ে যায় কারণ সংস্কৃতির আগ্রাসী চরিত্রের মতই ভাষারও একটি সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র থাকে। বৃহৎ ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে প্রায়শই গ্রাস করে নেয় ক্ষুদ্র ভাষাকে। সেকারণেই ক্ষুদ্র ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় একধরনের রক্ষাব্যূহ। আর তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হুমকির মুখোমুখি ক্ষুদ্র ভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সময়ে বারংবার, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ দানের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কোনও ফলোদয় হয়নি। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার শিশুরা যখন নিজ মাতৃভাষা পর্যন্ত ঠিকমতো শেখার আগেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিমণ্ডলে ভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নিজেকে অপরিচয়ের নিঃসীম মহাশূন্যে এক অসহায় মানব সন্তান হিসেবে আবিষ্কার করে। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা ওই শিশুটিকে জীবনের প্রথম স্কুলগমনেই এক অসহায় ভীতি-বিহ্বলতায় আক্রান্ত করে। ফলে তার কাছে স্কুল ও শিক্ষা উভয়ই একটি ভীতিকর বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়। সে ঠিকমতো কারও কথা বোঝে না বা বোঝাতে পারে না নিজের কথাও। ভাষার ভিন্নতা এক বিশাল ঘেরাটোপ হয়ে ঘিরে থাকে তাকে। সে

হয়ে যায় মূক-স্তব্ধ। এক'ধরনের হীনম্মন্যতার বোধ জন্ম নেয় তার চেতনায় যা সে কখনওই কাটিয়ে উঠতে পারে না এবং যার ফলে তার স্বাভাবিক মেধাবিকাশও বিঘ্নিত হয়। তখনই হয়ত সে-শিশুটি তার অবচেতনে চিৎকার দিয়ে ওঠে—'আমাকে আমার ভাষায় কথা বলতে দাও।' আসলেই নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের প্রধানতম মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকারের জন্যই মামলা দায়ের করেছিলেন ইয়োহান মাথিস মিকেলসেন গাফপ্লি; পৃথিবীর আদিবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর ভাষা ও সংস্কৃতিতে দক্ষতা অর্জনের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেন। নরওয়ের অধিবাসী 'শামান' জনগোষ্ঠীর সদস্য গাফপ্লির মাতৃভাষার নাম 'সামি'। সামি ভাষা ফিনো-উগুরিক ভাষা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হতে স্বতন্ত্র। ইয়োহান গাফপ্লি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিয়ে কখনওই নরওয়ের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে চাননি। স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে তিনি দেখেন তাঁর শিক্ষক সামি ভাষা জানেন না আর তিনি জানেন না নরওয়েজিয়ান ভাষা। ফলে তাঁর আর শিক্ষালাভ হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি নিরক্ষরতা ও অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হন। পরবর্তী জীবনে ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভে কোনও সাহায্য করতে পারতেন না বলে গাফপ্লির বড়ো লজ্জা হত। তাই তিনি স্ত্রীর সহায়তায় নরওয়েজিয়ান ভাষায় লেখা প্রথম বাল্যপাঠ পড়ে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর বড়ো ইচ্ছেছিল জীবনে অন্তত একটি বই সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করবেন। তাই তিনি অ্যান্টন হোয়েমের 'সামর্থ্য ও জ্ঞান' শীর্ষক সামি শিক্ষার ওপর গবেষণামূলক বইটি বেছে নিয়ে পড়া শুরু করলেন। এরপর তিনি সামি ভাষার পঠন ও লিখন শিখতে চাইলেন। তাই তিনি 'এ' লেভেলের অন্য সব বিষয়ও আয়ত্ত করে আল্টা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং এমন এক গবেষণায় লিপ্ত হন যা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণার ফল বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইয়োহান গাফপ্লি অতঃপর মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে না-পারার কারণে তাঁর জীবনে যে ক্ষতি হয়েছে এর প্রতিকার চেয়ে আত্মীকরণ-আগ্রাসী সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেন। যদিও তাঁর মামলাটি বিশ বছর পরে দায়ের করার কারণে তামাদি বিবেচনায় বারিত বলে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবু তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার মানুষের সবচেয়ে বড়ো মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমনকী আইনানুগ পদক্ষেপও গ্রহণীয়।

বাংলা—বাংলাদেশের প্রধানতম ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা-ই শুধু নয়, ভাষা হিসেবে এর উৎকর্ষ এবং অন্তর্গত ঐশ্বর্য ও উজ্জ্বল অবস্থানের কারণে পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো প্রক্ষেপিত হয়েছে কেবল এ-ভাষারই ওপর—আর বাকি ভাষাগুলো থেকে গেছে অনুজ্জ্বল অন্ধকারে। চিরাচরিত নিয়মেই এই বৈষম্য ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো, যাদের সংখ্যা সাধারণভাবে ৪৫টি বলে স্বীকৃত, তারা উন্নয়নের আলোক বঞ্চিত নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংকীর্ণ

চৌহদ্দিতে বন্দি থেকেছে। ফলে ক্রমে ক্রমে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারা। দূরত্ব আর উপেক্ষার এই অদৃশ্য প্রাচীর এই জনগোষ্ঠীগুলোকে একে অপরের কাছে ক্রমশ অপরিচিত করে তুলেছে। মানস-চেতনার এ চিত্রটি রূপায়িত হয়েছে বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ নলিনীকুমার ভদ্রের একটি রচনায়। তিনি সিলেটের মণিপুরীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একবার বলেছিলেন—'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী'। আসলেই তাই, আমাদের জনগোষ্ঠীগুলো প্রতিবেশী হিসেবে যুগের পর যুগ পাশাপাশি অবস্থান করেও পরস্পরের কাছে নিতান্তই অপরিচিত। ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিন্নতা স্বাতন্ত্র্যচেতনার ঘেরাটোপ হয়ে প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে একে অপরের কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছে—রেখেছে অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে ঢেকে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানবতা—ব্যাহত হয়েছে এক এবং অখণ্ড পরিচয়ে মানুষের অগ্রযাত্রা। সুতরাং, প্রয়োজন আজ অপরিচয়ের এই অবগুণ্ঠন উন্মোচনের। আর এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে ধর্মবর্ণ-শ্রেণি-ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সকল মানুষকে। আমরা জানি, ক্ষুদ্র এবং বৃহতের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা। বৃহতের থাকে শক্তি ও ঐশ্বর্যের অহমিকা—উচ্চম্মন্যতার অহংকার; আর ক্ষুদ্রের হীনম্মন্যতাবোধ, দুর্বলের অসহায়ত্ব। উভয়েই নিজেদের চারপাশে গড়ে তোলে বিশাল সীমানাপ্রাচীর—বৃহতেরা গড়ে ক্ষমতার দম্ভ দেখাতে আর ক্ষুদ্রেরা ভীতি ও অসহায়ত্বের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে। মানুষ হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য—প্রগতির পথ বেয়ে এগিয়ে যাবার জন্য মানুষের মাঝখানে মনুষ্যত্বকে আড়াল করে মাথা তুলে দাঁড়ানো এইসব সীমানাপ্রাচীরকে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে—সকলকেই একে অপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্য, মানুষে মানুষে এই মহাসম্মিলন মানুষের স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে বিলীন করে নয়—বরং তাকে অক্ষুণ্ন রেখেই। বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৃষ্টি করতে হবে অন্তর্গত ঐক্যের সুর। আর এই মহামিলনের মহাযজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে হবে রাষ্ট্রকেই—রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীয় বলয়ে অবস্থানকারী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা স্মরণে আনতে পারি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতের ত্রিপুরারাজ্যে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উদ্‌যাপনের কথা—যেখানে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার জন্য আত্মদানের এই মহান দিবসটি উদ্‌যাপিত হয় এক ভিন্ন আঙ্গিকে—'ভাষাদিবস' নামে। ত্রিপুরার রাজ্যভাষা এবং প্রধানতম ভাষা—বাংলা। কিন্তু তারপরও 'ভাষাদিবস'-এর সকল কর্মকাণ্ডে সরকারিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে রাজ্যের সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে। সরকারি অনুষ্ঠানমালায় বা প্রকাশনায় বাংলার পাশাপাশি অন্তত রাজ্যের অন্য প্রধান পাঁচটি ভাষা—ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, মগ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা ও সাহিত্য যেমন স্থান পায়—তেমনই সামগ্রিক অনুষ্ঠানমালায় সম্মিলন ঘটে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সেখানে নানা ভাষা ও জনগোষ্ঠীর জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অনুপম মেলবন্ধন ঘটে।

একুশে ফেব্রুয়ারির 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বস্বীকৃতি বস্তুত সেই চেতনারই বৈশ্বিক রূপায়ণ। ত্রিপুরায় আমি আরও লক্ষ করেছি, প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে যে বইমেলার আয়োজন করা হয় সেখানে এ পাঁচটি ভাষার জন্য সরকারিভাবে বিনা খরচে পৃথক পৃথক স্টল বরাদ্দ করা হয়। মেলামঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ পাঁচটি ভাষার জন্য এক-একদিন নির্ধারিত থাকে যেখানে ওই সংশ্লিষ্ট ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতি বছর এক-এক ভাষার বিশিষ্ট একজন লেখককে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ভাষা সম্মান' পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়, যাতে ওই ভাষাভাষী লেখক ও সাহিত্যিকেরা অনুপ্রাণিত হয়। বিভিন্ন প্রকাশকও ওইসব ভাষার সাহিত্যকর্ম প্রকাশের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। এটিকে তাঁরা প্রিয় অনুজের প্রতি দায়িত্বশীল অগ্রজের নৈতিক কর্তব্য বলেই বিবেচনা করে থাকেন। জাতীয়ভাবেও নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকর্ম ও সৃজনশীল রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মণিপুরী ভাষা তো সংবিধানস্বীকৃত ভারতের ২২টি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার একটি। সুতরাং এই ভাষার উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমি থেকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান, প্রকাশনাসহ নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর চর্চা ও বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যেও পরিচালিত হয়ে থাকে নানা কর্মসূচি। আমি এ-প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা করছি একারণে যে, এর আলোকে আমাদের দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা আমরা পর্যালোচনা করতে পারব। আমরা জানি এবং অহংকারও করে থাকি যে, বাংলাদেশ সেই দেশ এবং বাঙালি সেই জাতি যারা মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল; যে ইতিহাস আজ অপরিসীম গৌরবে-সৌরভে প্লুত হয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'; যার মূল চেতনা হল বিশ্বের প্রতিটি ভাষা, যা কোনও না-কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তার চর্চা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। এই দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র ও সরকারের এবং তার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় বলয়ে অবস্থানকারী দেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর। কিন্তু যে দেশ 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র অনন্য ইতিহাস আর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর অপরিসীম গৌরবের উদ্‌গাতা সেই বাংলাদেশে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষাগুলোর রাষ্ট্রীয় বা সরকারি স্বীকৃতি যেমন নেই তেমনই নেই কোনও ধরনের পৃষ্ঠপোষণাও। ভাষার মাসকে কেন্দ্র করে জাতির মননচর্চার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান 'বাংলা একাডেমি'তে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভাও। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানমালায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের কোনও অংশগ্রহণ বা উপস্থিতি নেই। অথচ একথা তো সত্য যে এদেশে বাংলার পাশাপাশি অনেক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আছে এবং যত ক্ষুদ্র বা নগণ্য হোক প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে নিজ-নিজ মাতৃভাষা কিন্তু

CamScanner

ভালোবাসার আংরাখায় মোড়ানো প্রিয়তম ভাষা। কিন্তু এদেশের সরকার বা বাংলা একাডেমির মত প্রতিষ্ঠান কখনও এইসব ভাষা ও সাহিত্যের কোনও খোঁজখবর করেনি। ফলে উপেক্ষা আর অবজ্ঞার কুয়াশা-চাদরে ঢাকা এইসব ভাষা ক্রমাগত অবহেলা আর অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে ক্রমশ ম্লান আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বিরাজমান এই নৈরাশ্যজনক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেও আমরা বিশ্বাস করি, যে দেশ মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়ে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে সেই দেশে অন্তত অন্য জাতির মাতৃভাষাগুলো উপেক্ষিত হবে না; যে জাতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় সেখানে তারা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সুতরাং এখন প্রয়োজন বাংলাদেশের এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাতৃভাষার প্রতি পরিপূর্ণ আলোক প্রক্ষেপণের, প্রয়োজন উপেক্ষার কৃষ্ণবিবর থেকে তুলে এনে এদের লালন ও বিকাশে যথাযথ সহযোগিতা করে এদের উজ্জ্বল করে তোলা। সবসময়ই প্রবল আশাবাদিতার উজ্জ্বল আলোয় অবগাহন করে বেঁচে থাকা এইসব জনগোষ্ঠী তাই সংগত কারণেই প্রত্যাশা করে, সমূহ প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বেঁচে থাকা এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাসমূহকে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন চিরে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসনের মহতী প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূতিকাগার আমাদের প্রিয় এই স্বদেশভূমিতে। এজন্য প্রয়োজন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে তাদের মাতৃভাষার লালন ও বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া—প্রয়োজন ক্ষেত্র সৃষ্টির এবং প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষণার। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে সরকারকেই, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে—আর এগিয়ে আসতে হবে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকেও অগ্রজের মহান ঔদার্যে। আর তারই পাশাপাশি অবশ্যই ভাবতে হবে দেশের প্রধানতম ভাষা 'বাংলা'কে নিয়েও। আমরা জানি, বাংলা খুবই উন্নত এবং উজ্জ্বল এক ভাষা। ভাষাভাষীর সংখ্যার বিচারেও বাংলা এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা। কিন্তু তারপরও এই সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না যে, উন্মুক্ত সংস্কৃতি-প্রবাহের এই যুগে আকাশ-সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে হয়ত এখনই বাংলা ভাষা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না, কিন্তু আমাদের অবজ্ঞায়-অবহেলায় যদি অবক্ষয়ের এই ঘুণপোকা রাতদিন নির্বিবাদে খেতে থাকে বাংলা ভাষার মেদ ও মাংস তাহলে একসময় এই সামান্য অবক্ষয় প্রাণঘাতী কর্কট রোগের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সুতরাং এই সমস্যাকে উপেক্ষা করা মোটেও ঠিক হবে না। আসলে, এখনই সময় আমাদের জেগে উঠবার।

সিলেট, ২০১৬

CamScanner

স্বপ্ন নিয়ে আমাদের স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নের প্রতি মানুষের থাকে সবসময়ই এক প্রবল পক্ষপাত। মানুষ তাই চিরকালই স্বপ্নবিলাসী। সে নিরন্তর স্বপ্ন দেখে—স্বপ্ন নির্মাণ করে—স্বপ্নের রহস্যময় পুষ্পক রথে চড়ে ছুটে চলে এক ভুবন থেকে আরেক ভুবনে; রচনা করে স্বপ্নময়তার এক অনিন্দ্য জগৎ। স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে যেতে পারে নিজস্ব নির্মাণকে—স্বপ্ন দেখে বলেই সে ভবিষ্যতের অতলান্ত গহ্বরে রচনা করে স্বপ্নের তিলোত্তমা নগরি। আর তাই মানুষ হয় স্বপ্নচারী; মহাকালের মহাসমুদ্রে অনন্ত-অন্বেষার এক স্বপ্নের ডুবুরি। কিন্তু কখনও কখনও দুঃস্বপ্নের অন্ধকার এসে হানা দেয় স্বপ্নের রুপালি জ্যোৎস্নায়। তছনছ হয়ে যায় স্বপ্নের সাজানো বাগান। তবু মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখে। কারণ, এই স্বপ্নের সোনালি ডানায় বাসা বেঁধেই মানুষ দুঃস্বপ্নের করাল অন্ধকার পেরিয়ে চলে যেতে চায় প্রত্যাশার আলোকিত নন্দনকাননে। তাই স্বপ্নের আর-এক নাম জীবন; বেঁচে থাকার প্রাণদ পাথেয়।

স্বপ্ন নিয়ে নানা বিশ্বাস যেমন আছে, তেমনই আছে স্বপ্নের নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। স্বপ্নের কারণ বা সংজ্ঞা নিয়েও নানা কথা আছে। অধিকাংশেরই মত হল, স্বপ্ন হচ্ছে সচেতন মনের চিন্তাভাবনা বা কল্পনা—যার প্রতিরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ঘুমের মধ্যে। অথবা অন্যভাবে বললে, স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের অবচেতনের খেলা—আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বা অবদমিত ইচ্ছা ও কামনা যা ঘুমের ঘোরে পাখা মেলে দেয় যখন আমাদের সচেতন মন অর্ধসুপ্তির রহস্যসাগরে সাঁতার কাটতে থাকে। স্বপ্ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি এবং গ্রহণযোগ্য কথা বলেছেন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। তিনিও মনে করেন আমাদের অবদমিত ইচ্ছেগুলো স্বপ্নের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াস পায়। তিনি স্বপ্নকে অর্থহীন-অসার মনে করেন না; তাঁর মতে স্বপ্ন একধরনের ইচ্ছেপূরণ। তাই কেউ কেউ বলে থাকেন, স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনোজগতের বিশেষ ঝোঁকগুলোর যথার্থ অনুবাদক; যদিও এর প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও কৌশল। কিন্তু আসলেই কি তাই? সব সময়ই কি আমরা সকল স্বপ্নকে আমাদের চেতন-অবচেতনের সকল দমিত বা অবদমিত ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা বা কামনার প্রতিবিম্ব হিসেবে শনাক্ত করতে পারি? অথবা, সব স্বপ্নই কি আমাদের অতৃপ্ত আত্মার

ইচ্ছেপূরণের প্রতিরূপ বলে মনে হয়? আমার বিশ্বাস এ-ব্যাপারে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করবেন। কারণ, আমরা কখনও কখনও এমন সব স্বপ্ন দেখি যার সঙ্গে আমাদের সচেতন মনের চিন্তাভাবনা বা কল্পনার কোনও সামঞ্জস্য নেই; এমনকী কষ্টকল্পিত দূর কোনও সংযোগও আমরা আবিষ্কার করতে পারি না। আমাদের দমিত বা অবদমিত ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার কোনও প্রতিফলন হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও আমরা দেখি না। আসলে অনেক স্বপ্ন এতটাই অদ্ভুত, অবাস্তব এবং অচিন্তনীয় যে আমাদের দূরতম কল্পনাও সেখানে পৌঁছুতে পারে না। স্বপ্নকে তখন কেবলই রহস্যময় বলে মনে হয়—মনে হয় এর যত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ আমরা দাঁড় করাই না কেন স্বপ্ন তবু থেকে যায় অধরা, অব্যাখ্যেয় এবং অবশেষে অনন্ত রহস্যময়।

কিন্তু এই যে রহস্যময় স্বপ্নের অনন্ত জগৎ আমার আগ্রহ মোটেও 'সেই স্বপ্ন'কে নিয়ে নয়। বরং যে স্বপ্ন আমরা জেগে থেকে দেখি অর্থাৎ যে স্বপ্ন আমরা সচেতনভাবে নির্মাণ করি—আমাদের নিজস্ব স্বপ্ন, আমার সকল ভাবনা ও চিন্তা সেই স্বপ্নকে নিয়ে। কমবেশি আমরা সবাই প্রায় প্রতিনিয়তই এরকম স্বপ্ন দেখি। ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক, ব্যষ্টি থেকে সামষ্টিক বা জাগতিক থেকে ইহজাগতিক, বাস্তব থেকে অবাস্তব কল্পনা সমস্ত বিষয় নিয়েই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে এই স্বপ্নের পরিধি। এমনি সব স্বপ্নকেই আমরা লালন করে থাকি হৃদয়ের প্রবল পক্ষপাতিত্বে এবং অনুকূল আলো ও হাওয়ায় একদিন অনুবাদ করি বাস্তবে। এই স্বপ্নেরাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে মৃত্যুর হাত থেকে—সমূহ পতন থেকে। অনিবার্যতার রূঢ় বাস্তবতায় দুঃস্বপ্নের গাঢ় অন্ধকার এসে যখন ঢেকে দেয় জীবনের আলোকিত উপত্যকা; যখন নানা বাধা-বিপত্তি, নীচতা, হীনতা, অশুভ-আঁধার ভয়ংকর দানবের মত আমাদের ক্রমশ টেনে নিয়ে যায় এক গভীরতম খাদের দিকে তখন এই স্বপ্নই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে—ভাসিয়ে রাখে অসহায় নিমজ্জন থেকে। আমরা তখন বাস্তবতার আগুন-জলের মধ্যেই নির্মাণ করি ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ। এই যে ভবিষ্যতের অতলান্ত গহ্বরে স্বপ্নের হেম-হর্ম্য নির্মাণ করা, এরকম স্বপ্নচারীরাই যুগে যুগে বদলে দিয়েছেন পুরাতন পৃথিবীকে আর রচনা করেছেন নতুন ইতিহাস। তেমনই এক স্বপ্নচারী মানুষ ছিলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, তিতুমীর, হাজি শরীয়ত উল্লাহ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। ছিলেন আরও অনেকে—যাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন চলিষ্ণু জীবনের, সোনালি স্বাধীনতার। আফ্রিকার কালো মানুষের ঘরেও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন—কঙ্গোর এক স্বাপ্নিক, প্যাট্রিস এমেরী লুমুম্বা। তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমগ্র আফ্রিকার আত্মাকেই। স্বপ্ন দেখেছিলেন আরেক কৃষ্ণসূর্য নেলসন ম্যান্ডেলা। স্বপ্ন দেখেছিলেন পল রোবসন আর বিপ্লবী চে' গুয়েভারা; যে নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে বিপ্লব, বিপ্লবী গেরিলার অদম্য এগিয়ে

চলা—ভেসে ওঠে স্বপ্ন আর স্বপ্নভরা কবিতার কথা। চে' আর্নেস্টো গুয়েভারা স্বপ্ন দেখতেন আর স্বপ্নের জোনাকি পোকাগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে কবিতা লিখতেন। শুধু মনে ও মস্তিষ্কে নয়, পেটে ও পিঠে তিনি বয়ে বেড়াতেন অবিনশ্বর স্বপ্নের সোনালি শস্যদানা। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আটকাবস্থায় চে'কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'তুমি এখন কী ভাবছো?' স্বপ্নের অতলান্ত গহ্বর থেকে তাঁর স্বপ্নালু দৃষ্টিকে তুলে এনে নির্বিকারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন চে'—'আমি বিপ্লবের অমরত্বের কথা ভাবছি।' আর্জেন্টাইন বিপ্লবী চে' গুয়েভারা কিউবার বিপ্লবকে সফল করার পর মন্ত্রিত্বের লোভনীয় পদ নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের মোহন মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে স্বপ্নকে সম্বল করে আবার ছুটে গিয়েছিলেন বলিভিয়ার গহিন জঙ্গলে—গড়ে তুলেছিলেন অদম্য এক গেরিলা বাহিনী। ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর বলিভিয়ার ছোট্ট পাহাড়ি শহর লা হিগুয়েরা গ্রামের একটি স্কুলঘরে বন্দি চে' গুয়েভারাকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। কিন্তু মৃত্যু হয়নি চে'র সেই অবিনশ্বর স্বপ্নের। কারণ, নশ্বর মৃত্যুর প্রায় সাড়ে চার দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও এখনও এই স্বপ্নচারী মানুষই স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছেন নিপীড়িত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে। চে' কবিতা ভালোবাসতেন। তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল পাবলো নেরুদার একটি কবিতার বই—'কান্টো জেনারেল'। চে' নিজেও কবিতা লিখতেন। তাঁর স্বপ্নগুলো সোনালি মাছের মত সাঁতরে বেড়াতো তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে।

> 'তুমি বলেছিলে, সূর্যোদয় হবে।
> চলো যাই
> সেই অচিহ্নিত পথে
> তোমার ভালোবাসার সবুজ কুমারকে মুক্ত করতে।
> এবং চলো আমরা
> সকল উপেক্ষাকে তুচ্ছ করি
> বিদ্রোহী প্রগাঢ় নক্ষত্র-প্লাবিত ভ্রূকুটিতে।
> হয় জয়ী হবো না হয়
> মৃত্যুকে যাবো পেরিয়ে।'
>
> ফিদেলের জন্য গান, চে' গুয়েভারা

কোটি মানুষের স্বপ্নকে হৃদয়ে ধারণ করে রক্তপলাশের মত জেগে ওঠা আর-এক স্বপ্ননায়ক হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি—যিনি রূপসি বাংলার এক প্রত্যন্ত জনপদ থেকে উঠে এসে একদিন পরিণত হয়েছিলেন সমগ্র জাতির প্রতিভূপুরুষে। বাঙালির শৃঙ্খলমুক্তির স্বপ্ন তাঁর সিংহ-হৃদয়ে লালিত হয়ে একদিন স্বাধীনতার সোনালি সূর্যরূপে উদিত হয়েছিল বাংলার আকাশে। তিনি বাঙালির ললাটলিপি থেকে মুছে দিয়েছিলেন ভীরুতার সমস্ত কলঙ্কচিহ্ন—মুছে

CamScanner

দিয়েছিলেন নতজানু আর বামনত্বের সব অপমানভার। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখতেন শৃঙ্খলমুক্ত এক জীবনের, অর্থনৈতিক মুক্তির—আর সে স্বপ্নকে তিনি ছন্দিত আবেগে প্রবাহিত করতেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়স্পন্দনে। মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা তাঁকে করে তুলেছিল বাংলা ও বাঙালির প্রতীকী-পুরুষে। তাই তিনি দ্বিধাহীন উচ্চারণে বলতে পারতেন—'ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে বলব বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, আমি বাঙালি।' তিনি কবি; তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ ছিল কবিতার মত। তিনি ছিলেন 'স্বাধীনতা' নামক অমর কাব্যের মহান কবি। এমনিভাবে স্বপ্ন দেখতেন আরেকজন—স্বপ্ন দেখাতেন আমাদেরও; হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতেন সেই স্বপ্নের ঢেউ সংগীতের সুরে সুরে। তিনি জন লেনন—বিখ্যাত বিটল্‌স্ চতুষ্টয়ের অন্যতম। তাঁর প্রিয়তমা ইয়োকে ওনোর একটি উক্তি লেননেরও খুব প্রিয় ছিল; তিনি প্রায়ই বলতেন—'মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে একা, তখন তা স্বপ্নই থাকে; যখন স্বপ্ন দেখে সবাই মিলে, তখন তা হয়ে ওঠে বাস্তব।' তাই তিনি সুরে সুরে ছড়িয়ে দিতেন তাঁর স্বপ্নের কথা—যাতে তা সকলের স্বপ্ন হয়ে বাস্তব হয়ে ওঠে একদিন।

'মনে করো নেই কোনও স্বর্গ
নরক বলেও নেই কিছু আর
ভাবতে চাইলে সহজ এই ভাবনা
আছে শুধু উদার আকাশ
মনে করো সব মানুষের
জীবনের জন্যই জীবনযাপন

মনে করো নেই কোনও রাষ্ট্র
শক্ত নয় মোটেই এই ভাবনা
মরবার কি মারবার নেই কোনও তাগিদ
নেই কোনও ধর্মের আচার
মনে করো সব মানুষের
শান্তিতে চলছে জীবন

বলতে পারো আমি স্বপ্নচারী
কিন্তু আমিত আর একা নই
আশা রাখি একদিন পাবো তোমাকেও
এবং এক হয়ে উঠবে গোটা বিশ্ব।'

ইমাজিন (মনে করো), জন লেনন

এই যে স্বপ্নচারী মানুষেরা, তাঁরা আমাদের স্বপ্ন দেখতে প্রলুব্ধ করেন। আর এ-তো আমরা জানি, একদিন তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন বৃথা যায়নি

CamScanner

মোটেও। থেমে থাকেনি কোনও নশ্বর মৃত্যুতে। কারণ, স্বপ্নতো অবিনশ্বর। অবিনাশী সে স্বপ্নের স্বপ্নযাত্রা কেবলই এগিয়ে চলে অবিনশ্বরতার এক অনাদি-অনন্ত পথে। এবং অতঃপর এক অনুকূল আলো ও হাওয়ায় সে স্বপ্ন একদিন অনূদিত হয় বাস্তবে। আমরাও তাই স্বপ্ন দেখি বারংবার। আমরা স্বপ্ন দেখেছি বায়ান্নতে—উনসত্তরে। তারপর সত্তরের পথ বেয়ে একাত্তরে এসে সে স্বপ্ন পরিপূর্ণভাবে অনূদিত হয়েছিল বাস্তবে। স্বপ্নের সুনীল আকাশে নিশ্চিন্তে ডানা মেলেছিল শান্তির শ্বেত কপোত—স্বপ্নের সবুজ উপত্যকা মুখরিত হয়ে উঠেছিল জীবনের জয়গানে—পূর্ব দিগন্তে চোখ মেলেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে দুঃস্বপ্নের এক কালোরাত এসে ঢেকে দেয় আমাদের স্বপ্নের সেই সোনালি সকাল। স্বপ্নের রং সব ফিকে হয়ে যায়। স্বপ্নহীনতার বিষণ্নতায় আক্রান্ত হই আমরা। ফলে, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রায় চার যুগ অতিক্রান্তির পরও এখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি; মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি এখনও প্রকাশ্যে দন্ত-নখর শানায়; সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে এখনও হঠাৎ হঠাৎ নীল হয়ে ওঠে স্বদেশের বুক; এখনও জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাস আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির এই শ্যামল-কোমল প্রান্তরে প্রায়শই মেলে দেয় তার করাল ছায়া। কিন্তু এ-তো কাম্য নয় কখনও—এরকম চায়নি কখনও আমাদের লক্ষ শহিদ। অতএব আমাদের আবার স্বপ্ন দেখতে হবে—স্বপ্নের অঙ্গীকারে জেগে উঠতে হবে যূথবদ্ধ শক্তিতে এবং সে স্বপ্নকে অনুবাদ করতে হবে বাস্তবে।

আসুন, আমরা তাই আজ সকলে মিলে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখি—অনেক রক্তের দামে কেনা আমাদের এই স্বদেশ থেকে চিরতরে নির্বাসিত হবে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাস; সকল যুদ্ধাপরাধী আর মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি নিশ্চিহ্ন হবে; নিশ্চিহ্ন হবে ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা; সকল দুর্নীতি আর অপশাসন মুক্ত হবে; দূর হবে যত অশুভ-আঁধার। আমাদের মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, শোষণমুক্ত সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নটিকে, আসুন আমরা সবাই মিলে হৃদয়ের বিমল ভালোবাসা আর অমল পরিচর্যায় ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তুলি। আর আমরা তো জানি, সবাই মিলে যখন একসঙ্গে স্বপ্ন দেখবো তখন নিশ্চিতই তা হয়ে উঠবে বাস্তব।

সিলেট, ২০১২

এ কে শেরাম

জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (জন্মকোষ্ঠী অনুযায়ী) বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন ১ নম্বর গাজিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গোবরখোলা গ্রামে। পিতা—নবকিশোর সিংহ ও মাতা—থাম্বাল দেবী। বর্তমানে ৩৫/বি কলকাকলী, লালাদিঘির পূর্বপাড়, সিলেট-৩১০০-এর স্থায়ী বাসিন্দা। বাণিজ্য ও আইনে স্নাতক ডিগ্রিধারী এ কে শেরাম সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, সিলেট; জাতীয় কবিতা পরিষদ, সিলেট; বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ, সিলেট; বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ এবং মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতিসহ আরও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিভিন্ন পদমর্যাদায়।

দেশে এবং দেশের বাইরে, বিশেষত ভারতের মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয় রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন অনেকবার। মণিপুরী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩১টি। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা পেয়েছেন ১৪টি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। স্ত্রী চন্দ্রা দেবী। এক কন্যা ও এক পুত্রের জনক।

নাগরী

ISBN 978-984-8021-51-4

9 789848 021514

NAGREE, Barutkhana
Sylhet-3100, Bangladesh
01714 610061, 01712 082967
nagree14@gmail.com

CamScanner